GULDASTA
BY
ABHA BASU

প্রকাশ কাল ঃ
পৌষ ঃ ১৩৬৭

প্রকাশক ঃ
আর বসু
ইষ্টল্যাণ্ড প্রেস সার্ভিস
২৯, ওয়াটারলু স্ট্রীট
(রুম নং ৮, দোতলা)
কলিকাতা৭০০০৬৯

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
নিতাই ঘোষ

মুদ্রক ঃ
সাধনা সিংহ রায়
কালী প্রেস
৬৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীপাদপদ্মে

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থঃ

১। জহন্নম থেকে জন্নত (উপন্যাস)

২। বসন্ত বৌরী (ছোট গল্প সংকলন)

৩। কসমোপলিটন লেডিজ হস্টেল (উপন্যাস)

—যন্ত্রস্থ

ভূমিকা

আমাদের কবিতাকৃতি ছাড়াও আতরের খুসবু ভরা বাতাস ভিনদেশের জানালা খুলে একটু আনলাম সবাইকে আনন্দ পরিবেশন করতে। 'গুলদস্তা' মানে এক গুচ্ছ ফুল, তাতে না থাক চেনা সুবাস, কিন্তু ফুলের সুবাসে কার অরুচী!

উর্দু ভাষায় যেমন আছে গভীরতা তেমনি আছে মিষ্টতা। এখন তো উর্দু শের ও গজল খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই কয়েকজন উর্দু কবির পরিচিতি ও তাঁদের কবিতাকৃতি দিয়ে সাজানো হ'ল এই ফুলের তোড়া।

উর্দু কবিদের কল্পলোকের কপোল কল্পনা শুধু সুরা সাকী ও গুল বুলবুল—এই সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে রয়েছে তাঁদের জীবনবোধ, অতলান্ত বেদনা আর ভাবনার প্রকাশ। এঁদের প্রেম ঈশ্বরের অনুগামী প্রকৃতি আর প্রকৃত প্রেমের অঙ্গাঙ্গী সম্মেলন। আমি এঁদের মূল ভাবটুকুকে ধরতে চেয়েছি। সেই রস সেই আনন্দকে ভাষান্তরেও মূলানুগ রাখতে চেষ্টা করেছি। আক্ষরিক অনুবাদ সব সময় সুখপাঠ্য হয় না, তাছাড়া কবির কবিতাকৃতির যথাযথ মূল্যায়নও হয় না, তাই অনেক জায়গায়ই আমি ভাবানুবাদ করতে বাধ্য হয়েছি। প্রকৃত উর্দু উচ্চারণ বজায় রাখার জন্য অনেক জায়গায় বানানেও সামান্য হেরফের করতে হয়েছে।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এ'দের পরিচিতি ও রচনা প্রকাশিত হবার পরে প্রচুর প্রশংসা এবং সম্মানই আমাকে এই বইখানি প্রকাশের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। পাঞ্চজন্য বাজিয়ে পঞ্চ কবিকে স্বোয়াগত করলাম, এবার এই শায়রদের সঙ্গে সুরের করে সবাই আনন্দ উপভোগ করলেই আমার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

॥ গ্রন্থকার ॥

সূচীপত্র

১। মির্জা গালিব ... ১

২। ইক্‌বাল আহ্‌মেদ ... ২১

৩। জিগর ম্‌রাদাবাদী ... ৪২

৪। ফিরাক গোরখপ্‌রী ... ৬৯

৫। সাহির ল্‌ধিয়ানবী ... ৮৫

মির্জা গালিব

মির্জা গালিব অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। কবির পুরো নাম মির্জা অসদ্-অল্লাহ্ খাঁ। গালিব ছিল এঁর তখল্লুস্ মানে পেন-নেম। প্রথমে তিনি 'অসদ্' নামে তাঁর শেরোশায়রী লিখতে শুরু করেন কিন্তু তেমন সাড়া মেলে না। তখন তাঁর এক জ্যোতিষী বন্ধু বলেন, নাম বদলাও দেখবে সোনা ফলবে। সত্যিই তাই হ'ল। 'গালিব' নাম নিয়ে লেখা শুরু করতেই তাঁর কবিতাগুলি সকলের মন গলিয়ে দিল। খ্যাতির শিখরে তুলে দিল তাঁকে। 'গালিব'-এর অর্থ চিন্তার খনি।

তাঁর কবিতার ভাষা ছিল বেশ কঠিন। তিনি নিজেই বলতেন, আমাকে যদি বুঝতে চাও তবে ফারসী ভাষায় আমার কবিতা পড়। ওঁর বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলতেন, মীর মির্জারা যা বলে তা বুঝি কিন্তু গালিব যে কি বলে তা একমাত্র গালিব নিজে আর খুদা বোঝেন। আবার গালিব তাঁর শায়রীকে সম্মান দিতে লিখেছেন—

আশান কহনে কী কহতে হ্যয় ফরমাইশ

গোয়ম মুশ্কিল, বর্না গোয়ম মুশ্কিল।

—হায় মেরে ইয়ার, আমি কী করি! কবিতাকে সস্তা করতে পারি না সোজা ভাষায় লিখে, আবার কঠিন ভাষায় লিখলে তোমরা নারাজ হও, যাই কোথায়!

কিন্তু উনি যেমনই লিখুন, সোনা ফলেছে। বাঁধাধরা গদ্যের গজল

আর রদিফ-কাফিয়া তুকবন্দির ধারা থেকে সরিয়ে উনি শেরোশায়রীতে আলাদা শান দিয়েছেন। গজলের মধ্য দিয়ে কোন মান্যগণ্যকে মান্যতা দেওয়া বা নিজের হৃদয়ের ব্যথা বেদনা প্রকাশ করা ছাড়াও তাঁর গজলে অন্য সুর বেজেছে, মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে মানুষ। এই মানব-দরদী কবির কবিতা তাই ভাষার অন্তরায় ছাড়িয়ে তাঁকে ভাবের জগতে পৌঁছে দিয়েছে। মহামান্য কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যেমন তাঁরা নিজেরাই তেমনি গালিবের সাহিত্যও বিশ্বমানের পর্যায় পড়ে। যেমন ছিল তাঁর কবি-প্রতিভা তেমনি রসজ্ঞান, আবার ঈশ্বর অনুভূতির গভীর চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ।

গালিব ছিলেন জাতিতে তুর্ক। তাই পেয়েছিলেন শক্তপোক্ত কাঠামোর উঁচু লম্বা শরীর, টকটকে আনারদানা রং আর প্রতিভাময় প্রশস্ত ললাট, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, উন্নত নাসা আর সুগঠিত দৃঢ় চিবুকের গঠন।

গালিবের দাদামশাই সমরকন্দ্ থেকে আগ্রায় এসে বসতি করেন। সেখানেই ১৭৯৬ তে মির্জা গালিবের জন্ম হয়। তাঁর বাবা লখনৌতে নবাব আসিফ-উল-দৌলার কাছে কিছুদিন চাকরি করে তারপর হায়দ্রাবাদ চলে যান। সেখানে হায়দ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় আলোয়ারে গিয়ে ফৌজে ভর্তি হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত লড়হাইয়ের ময়দানেই তাঁর প্রাণ যায়। রাজা বক্তাবর সিং তাঁর শৌর্য আর বাহাদুরগীতে এতই মুগ্ধ হয়ে যান যে মস্ত বড় এক জায়গির তাঁর দুই ছেলে মির্জা গালিব আর মির্জা ইউসুফের নামে লিখে দেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পরে গালিব তাঁর চাচা নাসিরুদ্দিন বেগের কাছে আগ্রাতেই ফিরে আসেন।

তিনি ছোটবেলায় আগ্রার নামী অধ্যাপক শেখ মুয়জ্জমের কাছে পাঠ নেন পরে আবদুস সমদ্ নামে একজন পর্যটকের কাছে ফারসীতে

তালিম নেন। যেমন তালিব-ইল্‌ম্‌ (ছাত্র) তেমনি তার উস্তাদ (গুরু)। রতনে রতন চেনে। ঐ ভদ্রলোকের গালিবকে খুব ভাল লেগে যায়। তাছাড়া তাঁর ক্ষুরধার মেধাও ওঁকে টেনে রাখে, তাই পর্যটন ছেড়ে পুরো দু'টি বছর উনি গালিবের সঙ্গে থেকে তাঁকে ফারসীতে একেবারে পারঙ্গম করে তোলেন। এরপর গালিব আর শুধু উর্দুতে শের লিখে সুখ পান না, ফারসী ভাষার গভীরতায় ডুবে যান। তাঁর কলমে আরবী ফারসী আর উর্দুর সংমিশ্রনে এক নতুন ভাষা জন্ম নেয়। এই ভাষা গালিবের নিজের সৃষ্টি।

মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি মুশায়েরাতে যোগ দেন। তের বছর বয়সে লোহারু বংশীয় নবাব-কন্যা উমরাও বানুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু বিবাহিত জীবন তাঁর সুখের ছিল না। তাঁর বেগম ছিলেন খুব মজহবী ও গোঁড়া ইস্‌লাম-পন্থী আর গালিব ছিলেন অন্য মতের মানুষ। তিনি শরাব পান করতেন, নিয়মিত মস-জিদেও যেতেন না, জাতপাতও মানতেন না। তিনি ছিলেন এসবের অনেক ওপরে। নিজেই লিখেছেন—

জানতা হুঁ সবাবে তায়তো জহদ্‌
পর তবীয়ত ইধর নাহি আতি।

—আমি তো জানিই ঠিকমত ধর্মাচরণ করলে খুদার দয়া পাওয়া যায়, কিন্তু আমার মনটা মোটেই ওদিকে যেতে চায় না।

উমরাও বেগম তাঁকে কদাচারি, কাফের বলে ঘৃণা করতেন। তাঁর খাওয়ার বাসনপত্র পর্যন্ত আলাদা করে দিয়েছিলেন। তবুও তিনি স্ত্রীকে রসিকতা করে বলতেন—দিনের বেলা যতই মজহবি আর পবিত্র থাকনা কেন, রাত্রে তো সব একাকার করেই দেব। এঁদের সাতটি সন্তান হয় কিন্তু একে একে সবাই মারা যায়। পরে দু'দু'বার দত্তক নেন, তারাও শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

এত দুঃখেও তাঁর মুখের হাসিটি মেলায়নি। মধুর ভাষায় বন্ধুদের স্বোয়াগত করতেন। কেউ কোন সাহায্য চাইলে নিজে না খেয়ে তাকে সাহায্য করতেন। ভারী মিশুকে আর অমায়িক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। হাজির-জবাব তাঁর ঠোঁটে লেগেই থাকত। মদ মাংস আঙ্গুর আর আম ছিল তাঁর প্রিয় খাদ্য। এসবের ওপরেও প্রচুর শের লিখেছেন। যে ভাবেই হোক এই জিনিসগুলি তিনি হাসিল করতেন। কিম্‌তি পোশাক পরতে পছন্দ করতেন, কেননা তিনি ছিলেন মুঘল বাদশাহ্ বাহাদুর-শাহ্‌র সভাকবি তাই পোশাকের শানও লাজমী মনে করতেন। বেশ রোবদাবের সঙ্গে থাকতেই ভালোবাসতেন। অনেকগুলি চাকরবাকর রাখতেন। কিন্তু এই বেহিসাবী খরচের জন্য প্রায়ই তাঁকে বেশ বেগ পেতে হ'ত। একবার একটি কবি সম্মেলনে লর্ড ক্যানিং তাঁকে একখানি জরীদার জোব্বা শিরোপা দেন। তাঁর পাওনাদাররা মনে করল যে তিনি অনেক টাকা উপহার পেয়েছেন তাই তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির। কিন্তু কবি তো আর টাকা পান নি। তাই নিরুপায় হয়ে জোব্বাটি চাকরদের হাতে দিয়ে বেচতে বলে দেন, আর নিজে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢোকেন। তারপর সেই টাকা দিয়ে পাওনাদারদের দেনা শোধ করে নিষ্কৃতি পান। আবার কখনও তিনি চাকরদের বলতেন— এই ব্যাটারা, তোরা আমার বদৌলত অনেক বিরিয়ানী আর গোস্ত্ খেয়েছিস। এবার আমাকে খাওয়া। তারাও তাঁকে জানের চেয়ে বেশী পেয়ার করত, তিনি ছাড়াতে চাইলেও তারা তাঁকে ছাড়ত না।

তাঁর অভিমানও ছিল খুব। একবার দিল্লী কলেজে ফারসী পড়াবার চাকরি পেলেন। তখনকার দিনে মাইনে একশোটা টাকা, অত অভাবের মধ্যে কম লোভনীয় নয়। কিন্তু সে চাকরিও তাঁর করা হল না। কারণ ঐ কলেজের সাহেব সেক্রেটারি তাঁকে বাইরে এসে স্বোয়াগত করে নিয়ে গেলেন না কেন, সেই অভিমানে তিনি

চাকরি নিলেন না। আমাদের মাইকেল মধুসূদনেরও ছিল এমনি অভিমান। সেদিন মাইকেলের বড় আনন্দের দিন। বাঙ্গালী বিদগ্ধ সমাজ আর সুধীজনেরা তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা মেঘনাদবধ কাব্য-কৃতিকে সানন্দে স্বীকার করেছেন। এখন তাঁরা সাহেব মধুসূদনের আবৃত্তি শুনতে চান, উপভোগ করতে চান সেই মেঘমন্দ্র ভাষার গুরু-গম্ভীর গাম্ভির্য আর শিরোপা দিতে চান মেঘনাদবধ-এর স্রষ্টাকে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য তারা সেই ব্রুহাম গাড়ী তো কই পাঠায় নি! গৌরমোহনের আনা ছ্যাকড়া গাড়ী দেখেই মধু ভীষণ রেগে গিয়ে বলেন, আমাকে কি না যেতে হবে ঐ গাড়ীতে ovation নিতে! No, no, never। ওরা ব্যবহার জানে না। Those natives don't know how to behave with a genius। বলেই তিনি বোতল খুলে বসে পড়লেন। গৌরমোহন প্রমাদ গুনলেন, শেষ পর্যন্ত একখানি পালকি এনে বলেন, ঐ দেখ বাহন এসেছে, এবার তো চল।

গালিব তাঁর দুঃখে সহানুভূতি জানানো মোটেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। বন্ধুরা কেউ তাঁকে সান্ত্বনা জানাতে এলে বলতেন—

ফির পুরসিশ-এ-জরাহত-এ-দিল কো চলা হ্যয় ইশ্ক্।
সামান-এ-সদ্-হজার-নমক্‌দাঁ কিয়ে হুয়ে॥

—এলেন সব নুনের জার হাতে অনুভাবি বন্ধুবররা, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দিলে ওদের মনের খুশী পূরণ হবে কি করে।

তাঁর জ্ঞানের বিস্তার করতে বিস্তর বই পড়তেন শাহী কুতুবখানা থেকে। গীতা উপনিষদেরও গভীরে চলে গিয়েছিলেন তিনি। আইন-ই-আকবরী নতুন করে রচনা করতে বসে বলেছেন, কী দরকার এসব কফন থেকে তুলে আনার, নতুন জিনিসে ধ্যান লাগাও।

গালিবের সমসাময়িক শায়ররা ছিলেন—শেখ মুহম্মদ, ইব্রাহিম জউক, হাকিম মোমীন, বেদী, উরফী, জাহুরী। কিন্তু এঁদের কারুর

সঙ্গেই তাঁর কবিতা মেলে না। তাঁকে বোধহয় তুলনা করা যায় একমাত্র Donny-র সঙ্গে। এঁর কবিতা-কৃতিতেও রয়েছে দেহের কামনা আর মনের চিন্তাধারায় এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

সিপাহী বিদ্রোহের পরে পরেই তাঁর বেশীর ভাগ মাসহারাই বন্ধ হয়ে যায়। রামপুরের রাজার একসময়ে তিনি গৃহশিক্ষক ছিলেন তাই সেখান থেকে ভালই সম্মানী পেতেন। তাছাড়া পেতেন দিল্লী দরবার থেকে। কেননা তিনি ছিলেন নবাব বাহাদুর শাহের সভাকবি। তাঁকে জেলেও যেতে হয় তাও জঘন্য জুয়াড়ীর বদনামে। কিন্তু তিনি ছিলেন আধুনিকতার পূজারী। দিন বদলের পরে নতুন পরিস্থিতিতে রাজ্যে শৃঙ্খলা আসবে এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।

এই মাসহারার ব্যবস্থা করতেই তাঁর কলকাতায় আসা। হুগলীর নবাবের কাছে দরবার করতে এলেন। কিন্তু দিল্লী থেকে কলকাতা আসতে তাঁর দু'বছর বেরিয়ে গেল। পথে পড়ল বেনারস, এলাহাবাদ, যেখানেই যান সেখানেই মুশায়েরার তুফান বইতে থাকে তাঁকে নিয়ে। মানে সম্মানে তাঁকে ভরিয়ে দেয় মানুষ। তাদের ভক্তির চোটে সময় ভেসে যায়। তবুও শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পৌঁছলেন। আসার সময় বাঁদার নবাবের কাছ থেকে দু'হাজার টাকা ধার করে আনেন তাও রাস্তাতে আর ইয়ার দোস্তদের খাতিরদারিতে অনেকটাই খরচ হয়ে গেছে, তবুও তাঁর তখন দরাজ দিল্। বেশ কয়েকটি বান্দা নিয়ে একটি ভাল বাড়ীতে উঠলেন। সয়ের করার জন্য একটি ঘোড়াও কিনলেন। অনেকেই তাঁর খাতিরদারি করল, মুশায়েরাতে সম্মানও পেলেন কিন্তু কলকাতার স্থানীয় উর্দু ফারসীর কবিরা তাঁর প্রতিভা দেখে হিংসের জ্বলতে থাকে; সামনে তাঁকে সালাম জানায় কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঘোঁট পাকাতে লাগল। তাঁর শেরোশায়রীরও ভুল ধরতে লাগল। কিন্তু গালিব এদের ফারসীর কবি বলে আমলই দিতেন

না। এরা তখন দল পাকিয়ে দরবার করে হুগলীর নবাবের কান ভাঙালো। এদিকে গালিবের অবস্থা দিনে দিনে শোচনীয় হয়ে উঠছে। হাতের টাকা ফুরিয়ে আসছে তবু তাঁর মাসহারার সুরাহা হ'ল না, আবার শুনলেন দিল্লীতে দরবার করতে হবে। খুবই মুষড়ে পড়লেন তিনি। এদিকে বাড়ীওয়ালা সমানে ভাড়ার তাগাদা করে করে শেষে একদিন দুমস্ত গালিবকে তাঁর চারপাই শুদ্ধ বাইরে গাছতলায় বার করে দিল। মজা দেখতে কিছু পরিচিতরা পেঁছুলো আর দুঃখ জানালে উনি ওঁর সেই অম্লান হাসিটি হেসে বললেন, কোই বাত্ নহি, খুদার দরবারে খুলো হাওয়ায় বসর করছি। কিন্তু এদিকে দিন আর চলে না তখন। সখের ঘোড়া বেচে দিলেন। শীত পড়ে আসছে, জোব্বাও চাই তাই বাবুর্চি বান্দাতে ছাঁটাই চালালেন। ওদিকে স্থানীয় কবিরা যেন তাঁকে অপমান করার কসম্ খেয়েছে। এত ঝামেলার মধ্যেও কিন্তু কলকাতাকে উনি ভালবেসেছেন, বলেছেন নতুন হাওয়া আছে এখানে। ইংরেজদের বিজ্ঞানের প্রচেষ্টাকেও বাহু-হাওয়া দিয়েছেন। এবার ঐসব শায়রদের শায়েস্তা করতে তিনি নতুন ক'টি শের নিয়ে মুশায়েরার ময়দানে নামলেন। তাঁর কিস্মতে আবার চার চাঁদ চমকালো। তাঁর শের শুনে তো বাহা বাহা পড়ে গেল। সেদিন আবার কন্সাল্ অফ্ হারাত্, ইরানের যুবরাজের প্রতিনিধি সেই মুশায়েরাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তো ফারসী ভাষায় এমন বেমিশাল শের শুনে মুগ্ধ। এঁরই প্রচেষ্টায় হুগলীর নবাব আলি আকবর খান মির্জা গালিবকে ডেকে পাঠিয়ে শিরোপা দিলেন আর মাসহারার ব্যবস্থাও করে দিলেন। অনেক বিশিষ্ট ইংরেজও তাঁকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাই তিনি তাঁর শের-এ লিখেছেন, কলকাত্তামে হঙ্গামাও আছে আবার [illegible] গর্মিও আছে। বন্ধু হরগোপাল তাফ্তাকে লিখেছেন—আমি তাই মানুষের কবি, [illegible]

পারখী, প্রত্যেক মানুষকেই আমি মুসলমান ভাবি। হিন্দু ক্রিশ্চান সবাইকেই আমি ভায়ের মত শ্রদ্ধা করি। এইবার তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও মুখ বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু 'কাতিল' নামে একজন কবি তখনো গালিবের ওপর রাগে ফুঁসছিলেন। গালিব কলকাতা থেকে দিল্লী ফিরে যাবার পরে 'কাতিল' ওঁকে একখানি চিঠি লেখে। কবি খেতে বসেছেন এমন সময় 'কাতিল'-এর চিঠি আসতে উনি ওনার এক শাগিদর্কে বলেন চিঠিটি খুলে পড়তে। শাগিদর্ চিঠিটি খুলে খানিকটা পড়েই কবির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, এ চিঠি আমি পড়তে পারব না উস্তাদ। উনি তখন চিঠিটি পড়ে হাসতে হাসতে বলেন, ব্যাটা ঠিকমত গালিও দিতে জানে না। গালি দিতে হলে, বাচ্চার মাকে গালি দিতে হয়, জওয়ান লোকের বিবিকে আর বুড়োর মেয়েকে গালি দিতে হয়!

গালিব নমাজ পড়তেন না, রোজাও রাখতেন না। পঁচিশ বছর বয়স অবধি সুর সুরা আর সাকীতে ডুবে ছিলেন। এক ডোমনীর সঙ্গে বেশ একটু আশনাইও হয়েছিল। এ যেন সেই আমাদের চণ্ডী ঠাকুর! যিনি ধোপানী রামীর মধ্যে শ্রীমতীর ভাব দেখতেন আর তাইতেই বিভোর হয়ে লিখেছিলেন—

> এক নিবেদন করি পুনঃপুনঃ, শুন রজকিনী রামী,
> যুগল চরণ শীতল দেখিয়া শরণ লইলাম আমি,
> রজকিনী রূপ, প্রাণ স্বরূপ, কাম গন্ধ নাহি তায়,
> না দেখিলে মন করে উচাটন, দেখিলে পরাণ জুড়ায়!

কিন্তু গালিবের মন সেই ডোমনী জুড়োতে পারে নি তাই এবার তিনি অন্য আর এক তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। দেহতত্ত্ব ছেড়ে ভগবদতত্ত্বে বিলীন হয়ে লিখেছেন—অব্র-এ-গুহরবার্, বিশ্বের চেতনা-দর্পণ। লিখলেন নিজেকে এমন অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে যেদিকে

তাকাবে শুধু তাঁকেই দেখবে। বলতেন, হমঃ উস্ত্, সবই তিনি। নদী, সাগর, সূর্য, বুলবুল, ভোমরা এসবই তো তাঁরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তাঁর ফারসী বই মেহর-এ-নীমরোজ-এ লিখেছেন, জগতের বাহ্য অস্তিত্ব নেই। খুদা ছাড়া আলাদা জগত নেই—হমঃ উস্ত্, সবই তিনি।

গালিব বলতেন, মানুষ খুদার সর্বোত্তম সৃষ্টি। মানুষের অনুভূতি আছে, বাকশক্তি আছে, আছে বুদ্ধি। গালিবের দৃষ্টিতে মানবের মহানতা খুবই উচ্চমানের যদিও তার বুদ্ধি সীমিত তবুও ঐ অসীম বুদ্ধিরই এক অংশ তো! আবার বাসনা কামনাও আছে, আছে লোলুপতা ; সর্বাঙ্গ দিয়ে দেহ-মন-বুদ্ধি দিয়ে সে বিশ্বের সমস্ত আনন্দ উপভোগ করতে চায়, আবার ইচ্ছে করলে সে নিজের বুদ্ধির সহায়তায় আর প্রাণের মিলনে খুদার উদ্ভাসকে অনুভব করতে পারে। দেখতে পায় রাত্রি আর উষার মহা মিলন। ধরতে পারে বিশ্বের শৃঙ্গারকারিণী শক্তিকে, বুঝতে পারে ব্রহ্ম অবিনশ্বর কিন্তু তাঁর সৃষ্টি নশ্বর তাই হয়তো তিনি এই ক্ষণস্থায়ী মানবের সহায়তাতেই নিজেকে বার বার প্রকাশ করেন, যেন সেই সম্ভবামী যুগে যুগে! তিনি বলতেন, মৃত্যুর পারে কেয়ামতে গিয়ে নতুন মানব জন্ম নেবে। তবে কি তিনি জন্মান্তর বাদ মানতেন। এক জায়গায় বলেছেন, এক আদম ফুরিয়ে গেলে অন্য আদম জন্ম নেবে, তার বুদ্ধির বিকাশে জগৎ নতুন দিক খুঁজে পাবে। সে নতুন সৃষ্টির দীপ জ্বালবে। আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূরক হিসেবেই যে বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন তিনি তা উপলব্ধি করেছিলেন।

গালিব সীমার বন্ধন মানতেন না। তিনি নিজেকে বলতেন—আঈন-এ-গজলখ্যানি অর্থাৎ গজলের আইনের বাইরে এক গুস্তাখ্,

বিদ্রোহী, ধৃষ্ট আর অশিষ্ট। তাঁর অসম্ভব শক্তিশালী দেহ ও বিশাল বুদ্ধির বিকাশকে বলেছেন, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ আত্মার জীবন্ত যুদ্ধক্ষেত্র। তাই তাঁর গজলে সেই গতানুগতিক নাজুকতা বা ভাবুকতার রমণীয় মোলায়েম সুর বাজত না। কান্নুর মান্যতা বা বিরহীর কান্নাও তাঁর গজলে শোনাতেন না। তাঁর লেখায় ছিল অন্য এক জাতের চমক আর উৎকর্ষ। তাঁর রুবাইতেও খুদার নাম গান বাজত না, বাজত অন্য এক সুর। তাঁর শায়রীতে ছিল বিশ্বের চেতনা দর্পণ। তাই তাঁর রচনা হয়ে উঠেছে ধ্রুপদী সাহিত্য।

নশ্বর মানবের মৃত্যুতেই অন্ত তা সে যতই মহান হোক। তাই এই মানব দরদী মহামান্য কবি মির্জা গালিবেরও নেমে এলো শেষের দিন। এক শীতের অন্তে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৯ সালে তিয়াত্তর বছর চার মাস বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। হজরত নিজামুদ্দিনের কবরের পাশে তাঁকে দফন করা হয়।

শের

১। কিত্‌নে শীরীঁ হ্যয় তিরে লব্‌, কি রকীব্‌।
গালিয়াঁ খাকে বে-মজা ন হুয়া ॥
—তোমার মিষ্টি মুখের গালাগালিও কত মিষ্টি,
তাইতো সানন্দে গালাগাল খেতেই চলে আসি।

... ...

২। দিখাকে জুম্বিশ-এ-লব হী তমাম কর হমকো।
ন দে জো বোসা তো মুঁহ সে কঁহী জবাব তো দে ॥
—আরে চুমু না হয় নাই দিলে সুন্দরী, একটিবার
তো এসে বল, দেব না চুমু।

... ...

৩। তুঝসে কিস্‌মত মেঁ মেরী সুরত-এ-কুফ্‌ল-এ-অবজদ।
থা লিখা বাত কে বনতে হী জুদা হো জানা ॥
—অক্ষর মিলতেই তালা খুলল, আর তোমাতে আমাতে
ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, অথচ এতদিন তো বেশ ছিলাম।

... ...

৪। তেরে ওয়াদে পে জিয়ে হম্‌, তো ইয়ে জান ঝুঠ জানা।
কি খুশী সে মর না জাতে, অগর এতবার হোতা ॥
—তোমার কথাতে ভরসা করেই তো বেঁচে আছি, তুমি সত্যিই
আসবে জানলে আমি তো খুশীতেই মরে যেতাম।

... ...

৫। তা ফির ন ইন্তজার মেঁ নীঁদ আয়ে উম্র ভর।
আনে কা অহদ্‌ কর গয়ে, আয়ে জো খ্বাব মেঁ ॥
—তোমার অপেক্ষায় জেগে জেগে রাত পুইয়ে এলো,
তুমি তো কই এলে না, শেষে কি না স্বপ্নে এলে!

৬। জমা করতে হো ক্যাউঁ রকীবোঁ কো।
ইক তমাশা হুয়া, গিলা ন হুয়া॥
—ঝগড়া তো তোমার আমার সঙ্গে, তা এত
প্রতিদ্বন্দী ডেকে জমা করছ কেন?

... ...

৭। কোঈ মেরে দিল সে পুছে তেরে তীর-এ-নীমকশ কো।
ইয়ে খলিশ কহাঁ সে হোতী, জো জিগর কে পার হোতা॥
—তুমি যে তীর মেরেছ তা যদি অর্ধেক হৃদয়ে এমন করে গেথে
না থাকত, তাহলে অহরহ এমন বেদনাও বাজত না।

... ...

৮। দামে-হর-মৌজ মেঁ হ্যায় হল্‌ক্‌-এ-সদ্‌কাম নিহংগ
দেখে ক্যেয়া গুজরে হ্যায় কত্‌রা পে গুহর হোনে তক॥
—ঘাটে ঘাটে কত বিপদ, আবার জলের ঢেউতে আছে কুমীর,
কত মুশকিলেই না বৃষ্টির ফোঁটাটি ঝিনুকের ভেতরে
ফেলতে হয়, তবেই না মুক্তো ফলে।

... ...

৯। গুঞ্চয়ে-নাশিগুফ্‌তা কো দূর সে মত দিখা কি ইয়ুঁ।
বোসে কো পুছতা হুঁ ম্যয়, মুঁহ সে মুঝে বতা কি ইয়ুঁ॥
—দূর থেকে দেখাচ্ছ কেন বেজান এক ফুলকলি, কাছে এসে
দাওনা একটি চুমু।

... ...

১০। ইশ্‌ক তাসীর সে নোমেদ নহী ।
জাঁ-সুপারী, শজর-এ-বেদ নঁহী ॥
—প্রেমের গাছে ফল ধরে না, প্রেমের ফাঁস গলায় পরলে ফাঁসিই অবধারিত।

... ...

১১। রগ-এ-সঙ্গ সে টপক্‌তা উয়ো লহু, কি ফির ন থমতা।
জিসে গম সমঝ রহে হো, ইয়ে অগর শরার হোতা ॥
—প্রেমের বেদনার দুঃখ পাথরে গিয়ে বাজলেও রক্তই চুঁইয়ে পড়ত, কিম্বা আগুনের ফুলকিই উঠত।

... ...

১২। থা খুয়াব মেঁ খ্যয়াল কো তুঝ সে মুআমলা।
জব আঁখ খুল গয়ী, ন জিয়াঁ থা, ন সুদ থা ॥
—ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখছিলাম, তুমি আমার সঙ্গে লেপ্টে রয়েছ, চোখ খুলতেই দেখি, কোথায় তুমি!

... ...

১৩। তজাহুল-পেশগী সে মুদ্দা ক্যেয়া ।
কহাঁ তক ইয়ে সরাপা-নাজ ক্যেয়া ক্যেয়া ॥
—আমার জন্য দেখছি তোমার কোন পরওয়াই নেই, এমন বেদরদী প্রেমিকার জন্য কে মরে!

... ...

১৪। হ্যয় বস্কঃ জোশ-এ-বাদা সে শীশে উছল রহে।
হর গোশা-এ-বিসাত, হ্যয় হর শীশাবাজ কা ॥
—বসন্তকালে সারা প্রকৃতি যেখানে নেশায় মাতাল, মৌসমে রঙ্গ-বেরঙ্গী বাহার, এখনই তো আকন্ঠ শরাব পান করব।

... ...

১৫। পরতবে খ্রুর সে হ্যায় শবনম কো ফনা কী তালীম।
ম্যঁয় ভী হুঁ এক ইনায়ত কী নজর হোনে তক॥
—প্রেমিক সূর্যের স্পর্শেই প্রেমিকা শিশির কণার অন্ত,
আমিও তেমনিই আছি তোমার এক দয়ার প্রত্যাশি হয়ে।

... ...

১৬। এক-নজর-বেশ নহীঁ ফুর্সতে-হস্তী গাফিল।
গর্মি-এ-বজ্‌ম্ হ্যায় ইক রক্স্‌-এ-শরর হোনে তক॥
—যতক্ষণ এই শরীরের মধ্যে এক আশার স্ফুলিঙ্গ নাচছে তত-
ক্ষণই রয়েছে জীবনের স্পন্দন।

... ...

১৭। অব ম্যঁয় হুঁ ঔর মাতম-এ-এক-শহর-এ-আরজু।
তোড়া জো তুনে আইনা তিমসালদার থা॥
—তুমি আমার মন ভাঙ্গনি, ভেঙ্গেছ একটা শহর, যেখানে তামাম
খুশী আর আরমান সাজিয়ে রেখেছিলাম।

... ...

১৮। ইঁয়ু হী দুখ কিসী কো দেনা নহীঁ খুব, বর্না কহতা।
কি মেরে অদু কো ইয়ারব। মিলে মেরী জিন্দগানী॥
—আমি যে কারুর দুঃখ সইতে পারি না, তাইতো খুদাকে
বলি, আমার জীবনটাই না হয় আমার দুশমনকে দিয়ে দাও।

... ...

১৯। জান্ তুম পর নিসার করতা হুঁ।
ম্যঁয় নহী জানতা, দুয়া ক্যয়া হ্যায়॥
—তোমায় আমার প্রাণ সঁপেছি
জানিনা তো প্রার্থনা কাকে বলে।

... ...

২০। ক্যাউঁ ন চীখূঁ ? কি ইয়াদ করতে হ্যয় ।
মেরী আওয়াজ গর নঁহী আতী ॥
—চিৎকার করলেই কি শুনতে পাবে ? গলায় যে আমার স্বর ফোটে না। তবুও আমি চিৎকার করি যদিই শুনতে পাও ।
... ...

২১। দাগ্-এ-দিল্ গর নজর নঁহী আতা।
বু ভী ইয়ে চারাগর ! নঁহী আতী ॥
—হৃদয় তন্ত্রী যে পুড়ে গেল, সে দাগও যদি দেখতে না পাও তো এই পোড়া হৃদয়টার দুর্গন্ধও কি পাচ্ছ না প্রভু !
... ...

২২। ছোড়ুঙ্গা ম্যয় ন উস্ বুত-এ-কাফর কা পুজনা।
ছোড়ে ন খল্ক্ গো মুঝে কাফর কহে বগৈর ॥
—আমার প্রিয়ই যে মূর্তিমান কাফের, আমাকে তোমরা হাজারবার কাফের বল, কিন্তু তাকে আমি ভালবাসবই ।
... ...

২৩। ঘর যব বনা লিয়া তিরে দর পর কহে বগৈর ।
জানেগা অব ভী তু ন মিরা ঘর কহে বগৈর ॥
—অনুমতি না নিয়েই তোমার ঘরের সামনে ঘর তুলেছি, আর তো বলতে পারবে না, তোমার ঘরে আমি যাব কি করে।
... ...

২৪। জঁহা তেরা নক্শ্-এ-কদম দেখতে হ্যয় ।
খিয়াবাঁ-খিয়াবাঁ হরম দেখতে হ্যয় ॥
—পৃথিবীর সর্বত্রই তোমার চরণ চিহ্ন আঁকা,
যেখানে যা কিছু দেখি তাতেই রয়েছে তোমার উদ্ভাস ।
... ...

২৫। অস্ল-এ-শুহুদ-ঈ-শাহিদ্-ঈ-মশহুদ এক হ্যয়।
হৈরাঁ হুঁ ফির মুশাহিদা হ্যয় কিস্ হিসাব মেঁ॥
—যিনি দেখছেন তিনি খুদা, যিনি দেখাচ্ছেন তিনিও খুদা, যা নজরে আসে সবই তো খুদাই খুদা, এই অনুভূতি বড়ই বিভ্রান্তিকর।

... ...

২৬। গর্দিশ-এ-রঙ্গ-এ-তরব্ সে ডর হ্যয়।
গম-এ-মহরুমি-এ-জাবেদ নহী॥
—খুশী তো আলো ছায়ার খেলা, তাই তো খুশীতে আমার ভয়। কিন্তু দুঃখ! সে একবার এলে তো যাবার নামটি করে না।

... ...

২৭। রাজ-এ মাশুক ন রুসওয়া হো জায়ে।
বর্না মর জানে মেঁ কুছ ভেদ নহীঁ॥
—মরতে আমি ভয় পাই না, ভাবি প্রিয়র বদনামী হবে, সবাই বলবে, তাঁর অত্যাচারে আমি মারা গেলাম।

... ...

২৮। হুয়ে মরকে হম জো রুসওয়া, হুয়ে ক্যঁউ ন গর্ক-এ-দরওয়া।
ন কভী জনাজা উঠতা, ন কহীঁ মজার হোতা॥
—মরে গিয়েও রেগে মরছি কেননা যদি দরিয়ায় ডুবে গিয়ে সিধে তোমার দরবারে পৌঁছে যেতে পারতাম, তা হ'লে না ওদের জানাজা তুলতে হত, না মজার বানাতে হত।

... ...

২৯। ইশক্ নে 'গালিব' নিকম্মা কর দিয়া।
বর্ণা হম ভী আদমী থে কাম কে॥
—আরে প্রেমে পড়েই তো 'গালিব' নিকম্মা হয়ে গেছে, না হলে সেও তো ছিল কাজের মানুষ।

... ...

৩০। দিল-এ-হর কতরা হ্যয় সাজ-এ-অন্ উলবহর।
হম উস্‌কে হ্যয়, হমারা পূছনা ক্যেয়া॥
—যেমন জলের কনা নাচতে নাচতে বলে, আমিই সাগর, তেমনি আমিও তো তাঁরই এক অংশ, সুতরাং চিন্তা কিসের!

. ...

৩১। ইশক্ পর জোর নহী, হ্যয় ইয়ে উয়ো আতিশ 'গালিব'।
কি লগায়ে ন লগে, ঔর বুঝায়ে ন বনে॥
—প্রেমের ওপর জোর খাটে না। এ এক এমনি আগুন যা লাগালে লাগে না, নেভালে নেভে না।

.. ..

৩২। বখ্‌শো হ্যয় জল্‌ওয়া-এ-গুল জোক্-এ-তমাশা 'গালিব'।
চশ্‌ম কো চাহিয়ে হর রংগ মেঁ ওয়া হো জানা॥
—ফুল সব সময় হাসে, সে কারুর দুঃখ সুখের পরওয়া করে না, মানুষেরও সেই শিক্ষা নেওয়া উচিত।

গজল

ইয়ে তাজা বারিদান-এ-বিসাত্-এ-হওয়া-এ-দিল ।
জিন্হার, অগর তুমহে হবস্-এ-নায়ো-নোশ-হ্যায় ॥
দেখো মুঝে জো দীদয়ে-ইবরত্-নিগাহ হো ।
মিরী সুনো জো গোশ-এ-নসীহত্-নিয়োশ হ্যায় ॥
সাকী, ব-জলওয়া দুশমন-এ-ঈমান-ঈ-আগহী ।
মুতরিব ব-নগ্মা রহজন-এ-তমকীন-ঈ-হোশ হ্যায় ॥
ইয়া শব কো দেখতে থে কি হর গোশ-এ-বিসাত ।
দামান-এ-বাগ্বান-ঈ-কফ্-এ-গুলফরোশ হ্যায় ॥
লুত্ফ্-এ-খিরাম-এ-সাকী-য়ো-জোক-এ-সদা-এ-চঙ্গ ।
ইয়ে জন্নত্-এ-নিগাহ, উয়োহ্ ফির্দৌস-এ-গোশ হায় ॥
ইয়াঁ সুবহ্-দম জো দেখিয়ে আকর, তো বজ্মু মেঁ ।
নৈ উয়োহ্ সুরুরো-সোজ, ন জোশ-ঈ-খরোশ হ্যায় ॥
দাগ্-এ-ফিরাক্-এ- সোহবত-এ-শব কী জলী হুঈ ।
ইক শময় রহ গঈ হ্যায়, সো উয়োহ্ ভী খমোশ হ্যায় ॥

—যারা নতুন নতুন প্রেম করছ তারা সচেতন থেকো। সব যদি ঠিক মত শুনতে চাও বুঝতে চাও তো আমার দিকে নজর দাও, আমার কথা শোনো। সাকীর কাছে গেলে ইমান ধরম সব বিকিয়ে যাবে, বুদ্ধিও বরবাদ হয়ে যাবে। রাতের প্রথম পর্বের মহ্ফিল্-এ সাকীর রং ঢং আর গান বাজনা আর গুলাবের গজরার ভরপুর সুগন্ধে এমনই মোহের সৃষ্টি হবে, মনে হবে যেন ইন্দ্রলোকে পৌঁছে গেছ। কিন্তু যতই রাত ভোর হয়ে আসে, সেই বাসী

মহ্‌ফিল-এ আর কোন মজা থাকে না। কোন তারুণ্য বা অভিলাষ থাকে না। না নেশা না নসিলী উত্তাপ, সব ফুরিয়ে যায়, শুধু পড়ে থাকে প্রদীপখানা, তাও নিবন্ত।

রুবাই

হ্যায় খল্‌ক্‌-হসদ্‌-কমাশ লড়নে কে লিয়ে।
বহশত-কদা-এ-তলাশ লড়নে কে লিয়ে॥
ইয়ানী হর বার, সূরত-এ-কাগজ-এ-বাদ।
মিলতে হ্যায় ইয়ে বদমাশ লড়নে কে লিয়ে॥

-ঘুড়ি আকাশে উঠলে একে অন্যের কাছে গেলেই লড়তে শুরু করে, বদমাশ আর খল লোকেরাও তেমনি এক হলেই লড়াই ঝগড়া শুরু করে দেয়।

নজ্ম্

জবকি তুঝ্ বিন নঁহী কোঈ মোজূদ্ ।
ফির ইয়ে হঙ্গামা, ইয়ে খুদা! ক্যোয়া হ্যায় ॥
ইয়ে পরী-চেহ্‌রা লোগ কৈসে হ্যায় ।
গম্‌জা-য়ো-ইশ্বা-য়ো-অদা ক্যোয়া হ্যায় ॥
শিকন-এ-জুল্‌ফ্-এ- অম্বরী ক্যাঁউ হ্যায় ।
নিগহ-এ-চশ্ম-এ-সুর্মা-সা ক্যোয়া হ্যায় ॥
সব্‌জা-য়ো-গুল কহাঁ সে আয়ে হ্যায় ।
অব্র ক্যোয়া চীজ হ্যায় ? হওয়া ক্যোয়া হ্যায় ॥

—যদি বল খুদাই নেই তবে এই অপূর্ব জগত সংসার কার সৃষ্টি! এই সুন্দরী প্রকৃতির আকৃতি কে দিল! কোথা থেকে এল এই পবিত্র সুগন্ধ! ঐ দূরে নীলিমার কাজল কালো রেখা কে টানল! কে হানে এই বজ্র বিদ্যুৎ! কে ফোটায় এই অজস্র ফুলের রাশ! আর মেঘ আর হাওয়া, এরাই বা এলো কোথা থেকে!

ইক্‌বাল আহ্‌মেদ

উনিশ শতকের শায়ের মহাকবি স্যার ইক্‌বাল আহ্‌মেদ ১৮৭৫ খৃঃ শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। তিন শ' বছর আগে এঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। পিতা শেখ্‌ নূর মহম্মদ-এর শিয়ালকোটে ছোটখাট ব্যবসা ছিল। কিন্তু জ্ঞানের পরিধি তাঁর ছোট ছিল না। সেই কারণেই নিজের দুই পুত্র অতা মহম্মদ আর মহম্মদ ইক্‌বালকে যথেষ্ট উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিয়েছিলেন। অতা মহম্মদ পাশ করে হলেন ইঞ্জিনিয়ার আর মহম্মদ ইক্‌বাল হলেন সাহিত্যের ইঞ্জিন। তাঁর বয়লারে জ্বলতে লাগল প্রতিভার আগুন। আর তাতে ইন্ধন যোগাতে লাগল আরবী, ফারসী, ইংরেজী, জার্মান সব ভাষাই। শিয়ালকোট থেকে এফ-এ পাশ করে লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে ভর্তি হন ইক্‌বাল। সেই সময় উনি সৈয়দ মীর হাসান-এর মত বিদ্বান আর স্নেহময় মৌলভীর সাহায্য পান। তিনিই ওঁর কোমল মনে প্রথম সাহিত্য সাধনার বীজ উপ্ত করেন। কিশোর বয়স থেকেই ইক্‌বালের কলমে চমৎকার সব 'কলাম' কথা বলত। ১৮৯৯ সালে উনি লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজ থেকেই গ্র্যাজুয়েট হন। কলেজে পাঠকালীন বিখ্যাত দার্শনিক প্রফেসর আর্নল্ড-এর সাহচর্য পান। ইক্‌বালের তীক্ষ্ণ মেধা আর অনুসন্ধিৎসু স্বভাব তাঁকে আকৃষ্ট করে, তাই নির্দ্বিধায় তিনি এঁর কাছে মেলে ধরলেন পাশ্চাত্য দর্শনের ডালা। গ্র্যাজুয়েট হবার পর লাহোর কলেজেই প্রায় ছ'বছর তিনি দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তারপর উচ্চশিক্ষায়

মানসে তিনি ইয়োরোপ চলে যান। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে ডিগ্রি পাবার পর তিনি ইরানের দর্শনশাস্ত্রের ওপর একটি বই লেখেন। সেটি আবার জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। এরই ওপরে জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে। তা ছাড়া ১৯২২ সালে তিনি নাইট উপাধি লাভ করেন। পাঞ্জাব বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশনে সাক্ষ্য দেন। মুস্‌লিম লিগ-এর সদস্য মনোনীত হয়ে রাউন্ড-টেব্‌ল্‌ কনফারেন্সে যোগ দিতে আবার ১৯৩১ সালে ইয়োরোপ যান। সেই সময় তিনি স্পেন, ইটালী এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশগুলি ভ্রমণ করে আসেন।

ইক্‌বাল ধর্মে মুসলমান ছিলেন কিন্তু কর্মে তাঁর ছিল সর্বজাতি সমন্বয়। সব জাতের মানুষই তাঁর বন্ধু ছিল। হিন্দুদের প্রাচীন সাহিত্য বেদ উপনিষদ, শিখদের গ্রন্থসাহেব, বৌদ্ধদের জাতক, এ সবই তিনি আদ্যোপান্ত আয়ত্ত করেছিলেন। রামায়ণের উর্দু অনুবাদ করারও তাঁর বিশেষ ইচ্ছে ছিল। আর ইচ্ছে ছিল ইংরেজীতে The book of a forgotten prophet বইখানি লেখার। কিন্তু মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ায় এই সব ইচ্ছে তাঁর অপূর্ণই থেকে যায়। হিন্দু দেবদেবীদের ওপরেও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিতা রচনা করেছেন, যেমন 'নয়া শিবালয়', 'স্বোয়ামী রামতীর্থ', 'রাম', 'হামারা দেশ', 'নানক', 'আব্‌র-এ-কহসার' ইত্যাদি।

১৯০৮ সালে ইয়োরোপ থেকে ফিরে এসে প্রথমে প্রফেসারিই করেন তারপর ব্যারিস্টারি শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য সাধনাতেই মনোনিবেশ করেন। তাঁর তিনটি বেগম থাকা সত্ত্বেও সংসার ছিল নিরবচ্ছিন্ন শান্তির। তাই তাঁর সাহিত্য তরীও উর্দু, ফারসী আর আরবীতে তর তর করে বইতে থাকে। দরকার না

পড়লে তিনি বড় একটা বাইরে যেতে পছন্দ করতেন না। হোসিয়ারপুর-নিবাসী বন্ধু কবি গিরামী একবার তাঁর কাছে যেতে বলায় তিনি বলেছিলেন, নিজের বাড়ীতে আমি 'নোয়াজ আর্ক' তৈরী করেছি। সৃষ্টির সব রহস্যের নমুনাই রয়েছে আমার সামনে। এখান থেকে কোথাও যাব না। বিভিন্ন ভাষার দুষ্প্রাপ্য বইয়ে ভরা ছিল তাঁর লাইব্রেরী। সেখানেই থাকতেন দিনের বেশীর ভাগ সময়। অদ্ভুত কর্মক্ষমতা ছিল তাঁর। বিভিন্ন ধারার ভিন্ন ভিন্ন রচনায় তাঁর যে দক্ষতা ছিল, এ যুগে তার সমকক্ষতার নিদর্শন বিরল। তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয় উর্দুতে লেখা অর্থবিজ্ঞানের ওপর। আবার অর্থবিজ্ঞানের লেখকই লিখেছেন চিন্তাশীল প্রবন্ধ উর্দু এবং ফারসীতে, এরই সঙ্গে সঙ্গে রচনা করেছেন যুগান্তকারী দর্শন সম্বন্ধীয় কবিতা। তাঁর পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয়, একাধারে তিনি ছিলেন প্রতিভাধর বাগ্মী, অসাধারণ ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, কূট রাজনীতিবিদ, একনিষ্ঠ শিক্ষা-ব্রতী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ যশস্বী আইনবেত্তা, অগ্রণী রাজপুরুষ, দক্ষ অধ্যাপক এবং শিল্পকলার সূক্ষ্ম সমালোচক। তিনিই প্রথম উর্দু ও ফারসী সাহিত্যের ফরসীতে জ্বাললেন দেশাত্মবোধের আগুন। পরাধীনতার গ্লানি সেই আগুনকে করল আরও লেলিহান। সুফী মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলাম-এর অন্ধ গোড়ামীর গোড়া ধরে নাড়া দেন। সমালোচনায় মুখর হয়ে বলেছেন—

মজহব্ নহী সিখাতা আপস মেঁ বৈর রখনা,
হিন্দী হ্যায় হম, বতন হ্যায় হিন্দোস্তাঁ হমারা।
—ধর্ম কখনও আপনজনের সঙ্গে শত্রুতা করতে শেখায় না,
আমরা সবাই হিন্দু, কেননা আমাদের মাতৃভূমি হ'ল হিন্দুস্থান।

তিনি বলতেন, তোমরা বল ইসলাম ধর্ম উদার, তাহলে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মনও উদার কর।

ধর্মের নামে কুসংস্কার আর আল্লর নামে পর্দা প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। তাঁর লেখা 'অশরারে-খুদী' (অহংভাবের রহস্য) বইটিতে রয়েছে তাঁর নিজেরই আত্মার সঙ্গে নিরন্তর অন্ত-র্দ্বন্দ্বের নিদর্শন। দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ তাঁর পরাধীন মন অবারিত মুক্তির কামনায় অবিরত মাথা কুটেছে।

অবাস্তবতার আড়ালে বসে হাফিজ বা গালিব যে ধরণের আধ্যাত্মি-কতার গান গেয়েছেন, ইক্‌বাল সেখানে হেনেছেন প্রখর বাস্তবের শানিত কুঠার। তাঁর 'অশরারে খুদী' বইখানি ডঃ নিকলসন ইংরেজীতে অনুবাদ করায় সমস্ত পাশ্চাত্যে সাড়া পড়ে যায়। এরই জন্য তিনি 'স্যার' উপাধি পান। পরে অবশ্য তিনি নাইটহুড পরিত্যাগ করেন এবং নিজেকে শুধুই ইক্‌বাল বা মহম্মদ ইক্‌বাল নামে পরিচিত করেন। 'ইক্‌বাল' মানে যশ। তিনিই স্বয়ম্ভু, শুধু তাঁর নিজের নামেই আজও তিনি সকলকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করছেন। 'ইন্‌কিলাব' (রাষ্ট্র-বিপ্লব) কথাটি তাঁরই সৃষ্টি। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' (রাষ্ট্রবিপ্লব জারি হোক) সেই সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর লেখা 'তরানা-এ-হিন্দী' আজও আমাদের জওয়ানদের উৎসাহ জোগাচ্ছে।

তিনি সারারাত ধরে মুশায়েরাতে তরন্নুমের সঙ্গে ভরাট গলায় শায়রী করতেন। তাঁর ছাত্ররা কবিতাগুলি টুকে রাখত। তিনি বলতেন, মুশায়েরার প্রয়োজন বই-এর চেয়ে কিছু কম নয়। কারণ অল্প শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে বই-এর চেয়ে ভরাট গলায় সুর-সম্বলিত কবিগান বা শায়রী অনেক বেশী অর্থবহ। এক সময় তিনি মুশায়েরার পর মুশায়েরাতে রাতের পর রাত স্বাধীনতার গান গেয়ে মাতিয়ে তুলেছিলেন জনসাধারণকে। তিনি বলতেন, ভাষা হল ভাবের ধারক, সে কিছু দেবতা নয় যে সুললিত শব্দের মালা গেঁথে তাকে

পরাতে হবে। আপন বৈশিষ্ট্যে আপনি সমুজ্জ্বল হবে রচনা, তার প্রতিটি শব্দ গিয়ে মানুষের মনে সাড়া তুলবে. উদ্‌বুদ্ধ করবে তাকে জ্ঞান অর্জনে, তবেই হবে সে লেখা সার্থক। তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতা 'হিমালয়' এক সময় দেশে আলোড়ন তোলে। 'জারব-ই-কলাম' বইখানি তাঁর রসঘন সাহিত্য নয়, শানিত তরবারি।

পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর অসাধারণ। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবীতে দর্শন পড়াতেন আবার লাহোরে থাকাকালীন দর্শন পড়াতেন ইংরেজীতে। ইংরেজীতেও অনেক চিন্তাশীল প্রবন্ধ এবং কবিতা রচনা করেছেন। জীবনের প্রথম ভাগে তিনি উর্দুতে কবিতা লিখেছেন। এই সময় প্রকৃতির ভাবে বিভোর হয়ে যে সব কবিতা রচনা করেছেন তার ভাবধারায় আছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং লঙফেলোর ছায়া। তারপর যত বয়স বেড়েছে জীবন দর্শনের গভীরে গিয়ে ফারসীর দিকে ঝুঁকেছেন। বলেছেন, পাঠকের পরিধি বাড়াতে ফারসীই হ'ল উপযুক্ত মাধ্যম। তাছাড়া ফারসীর মত সম্পদশালী ভাষার আধারেই আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তি সহজে উৎকর্ষ লাভ করে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে 'জাবেদনামা' বইখানির নাম। সুধীজনের মতেও এইটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা; এটিকে ফিরদৌসীর শাহ্‌নামা, দীবানে-হাফিজ, মস্‌নবী-মৌলানা রুমি আর গুলিস্তানে-সাদী, ফারসীর এই অমূল্য গ্রন্থগুলির সঙ্গে অসঙ্কোচে একাসনে রাখা যায়। এই 'জাবেদনামা' অনেকটা মিল্‌টন-এর প্যারাডাইস লস্ট-এর ধরণে লেখা। মিল্‌টন প্যারাডাইস লস্ট রচনার আগে তাঁর এক বন্ধুকে যেমন চিঠি লিখেছিলেন—'আমার পাখা গজিয়েছে কিন্তু সে পাখার এখনও ঠিক উড়ে যাবার মত জোর হয়নি, হলেই আর কিছুদিন তুমি আমার নাগাল পাবে না।' ঠিক এই রকম কবি ইক্‌বালও তাঁর কবি-বন্ধু হালিকে লেখেন—'আমি মহাত্মা রুমীর

সঙ্গে কিছুদিনের জন্য অন্য-লোকে বেড়াতে যাচ্ছি, ফিরে এলে তখন তোমার সঙ্গে মোলাকাত হবে।'

এই 'জাবেদনামা'-তে তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক রুমীর পবিত্র আত্মার নেতৃত্বে চন্দ্রলোক, বুধলোক, সুরলোক, শুক্রলোক, মঙ্গল ও শনিলোক পরিভ্রমন করতে যান। এই বইখানির উপপাদ্য বিষয় হ'ল ঐ ভ্রমণ-কাহিনীর ঘটনাবলী।

...বুধলোকের এক অপ্সরা ওঁকে অনুযোগ করে বলছে—কে হে তুমি! এ তোমার কেমন নিরাসক্তি যে আমার মত সুন্দরীতেও কোন আসক্তি নেই!

উত্তরে উনি বলছেন—কি করব বল সুন্দরী! কোন সুন্দর সৃষ্টি দেখলেই আমার মনে এক অনাসৃষ্টির আবেগ জাগে। মনে হয় নিশ্চয়ই এর চাইতেও আরও সুন্দর কিছু আছে। আহা! সেটি যদি আমি দেখতে পেতাম!

কখনোই তাঁর মধ্যে সন্তুষ্টি আসেনি। এই ভাবেই তিনি ভালর চেয়ে আরও ভাল, সুন্দরের চেয়ে সুন্দরতরের সাধনায় নিরন্তর নিয়োগ করেছেন নিজেকে। সুরা আর সাকী, গুল আর বুলবুল যা উর্দু কবিতার প্রতিপাদ্য ছিল তাকে আমূল পরিবর্তিত করে অন্য ধারায় নিয়ে গেছেন তিনি।

সুরপুরে পৌঁছে মহাদেবের সঙ্গে যে বাক্যালাপ করেছেন তাতেই বোঝা যায় যে দেশীয় দর্শনের কত গভীরে পৌঁছতে পেরেছিলেন তিনি। ঠিক যেন সেই যমরাজ আর নচিকেতার প্রশ্নোত্তর!

...সুরলোকে মহাদেব কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইলেন, তারপর আমার দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন. বলতো বুদ্ধির মৃত্যু কি? আমার উত্তর—চিন্তা ত্যাগ করা।

ওঁর প্রশ্ন: মনের মৃত্যু কি? আমার উত্তর: চর্চা বা অভ্যাসের ত্যাগ।

প্রশ্ন ঃ শরীর কি ? উত্তর ঃ ব্রহ্মার রহস্য।

প্রশ্ন ঃ মনুষ্য কি ? উত্তর ঃ এও ঐ রহস্যের অন্তর্গত এক রহস্য।

প্রশ্ন ঃ শিল্প কলা ? উত্তর ঃ বাহ্য আবরণ মাত্র।

প্রশ্ন ঃ সংসারের মানুষের ধর্মমত কি ? উত্তর ঃ শ্রুতি, শুধু শোনা কথা।

প্রশ্ন ঃ মুনি ঋষিদের ধর্মমত কি ? উত্তর ঃ দর্শন, তাঁরা যা দেখেন তাই মানেন।

আমার উত্তরে তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন—

মূর্তি কে সামনে জাগ্রত হৃদয় বালা কাফির উস্‌
দীন্‌দার সে অচ্ছা হ্যয় যো কাবে মেঁ সো রহা হো।
—হৃদয়বান বিধর্মী ভণ্ড ভক্তের চাইতে শতগুণে বাঞ্ছনীয়।

এই হল ইক্‌বাল-এর 'জাবেদনামা'র ভাষ্যের সামান্য নমুনা।

তিনি ভক্তিতে লুটিয়ে পড়ে ভগবানের কাছে কখনও কিছু ভিক্ষে করেন নি, উপরন্তু তাঁকেই ভর্ৎসনা করেছেন, কৈফিয়ত চেয়েছেন তাঁর কাছে। জেরায় জেরায় জেরবার করে শেষে তাঁকেই এই সামান্য মানবের কাছে হার মানতে বাধ্য করেছেন। এই মর্মে লেখা বড় একটি গজলের একটি স্তবক ঃ—

অফ্‌লাক সে হ্যয় উসকী হরীফানা কশাকশ।
খাকী হ্যয় মগর খাক সে আজাদ হ্যয় মোমিন॥
খুদী কো কর বুলন্দ্‌ ইতনা কি হর তক্‌দীর সে পহ্‌লে।
খুদা বন্দে সে খুদ পূছে, বতা তেরী রজা ক্যোয়া হ্যয়॥

—আমরা মাটির মানুষ কিন্তু আমাদের বুদ্ধি তো মাটি হয়ে যায় নি। সেই বুদ্ধির চেতনাকে আরও শানিত কর, নিজেকে নিয়ে যাও শ্রেষ্ঠত্বে, তখন ওপর থেকে ঐশী শক্তি আপনি নেমে এসে জিজ্ঞেস করবে, বৎস! তুমি কি চাও!

এমনি কথা আমাদের পরমহংসদেব এবং শ্রীঅরবিন্দও শুনিয়েছেন। 'লাইফ ডিভাইন'-এ শ্রীঅরবিন্দ বার বার বলেছেন—তাঁর কাছে তাঁর সৃষ্টিও কম প্রিয় নয়, সুতরাং এই পৃথিবীতে মাটির মানুষের মধ্যে নেমে আসতে তিনি বাধ্য।

ইক্‌বাল মুসলমান ধর্মযুদ্ধের সম্বন্ধেও অনেক কিছু লিখেছেন। তাছাড়া আছে ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস, যেমন—

মশা এসে তাঁকে বলছে, শোন! তোমার এত বড় শরীর থেকে মাত্র এক বিন্দু রক্ত আমি পান করলাম। উনি বলছেন, বেশ করেছ, ওর চেয়ে অনেক বেশী রক্ত চুষে নিচ্ছে বিদেশী প্রভুরা তাদের গোলামদের শরীর থেকে।

খুদা ইনসানকে বলছেন—হে মানুষ! আমি মাটি আর জল দিয়ে সংসার তৈরী করলাম, আর তুমি সেখানে ইরান, তুরান, তাতার সৃষ্টি করলে! আমি পৃথিবীর গর্ভে লোহা লুকিয়ে রেখেছিলাম, তোমরা তাই খুঁজে বার করে খর্পর, খঞ্জর তৈরী করে হানাহানি শুরু করলে! আবার মানুষ খুদাকে বলছে—তুমি রাতের অন্ধকার সৃষ্টি করেছ, আমি প্রদীপ জ্বালিয়ে তাকে উজ্জ্বল করেছি; তুমি প্রকৃতির বুকে বন, পর্বত, মরুভূমি তৈরি করেছ আর আমি তাতে জলাশয় তৈরি করেছি, রঙীন ফুল ফুটিয়ে তার শোভা বাড়িয়েছি! এমনি আরও অনেক রচনা।

তাঁর বহু প্রশংসিত এবং বিতর্কিত কয়েকখানি বইয়ের নাম—খুদী, অশ্‌রারে-খুদী, রুমুজ-ঈ-বেখুদী, সিকোয়া, জওয়ার-ঈ-সিকোয়া, শমা-ঔর-শায়ীর, জাবেদনামা, বাল-ঈ-জিব্রাইল, দারব্‌-ঈ-কালিম, ফারসীতে লেখা—পশ্‌চাই-বাইয়াদ-কার্দ, ফারসী উর্দু সংমিশ্রণে লেখা—আরমুগান-ঈ-হিজাজ।

তাঁর পরবর্তী কয়েকজন কবি—ফয়েজ্‌ আহ্‌মদ ফয়েজ্‌, জোশ

মলিহাবাদী, ফিরাক গোরখ্‌পুরী, হাফিজ জলন্ধরী তাঁর মতবাদের অনুসারী ছিলেন।

বিপুল কর্মযজ্ঞের হোতা, মহাকবি মহম্মদ ইক্‌বাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯৩৮-এ লাহোরে। তাঁর শবযাত্রার সঙ্গী হয়েছিল সর্ব-জাতীর প্রায় সত্তর আশি হাজার শোকে মুহ্যমান জনতা।

তাঁর কবরের প্রস্তর ফলকে যা লেখা হবে তাও তিনি মৃত্যুর আগেই রাজা হাসান আখ্‌তার, মুহম্মদ সফি, হাকিম কোরেশী, এই সব বন্ধুদের কাছে বলে যান—

—যখন আমি পৃথিবী পেরিয়ে পাড়ি জমাতে চলেছি, তখন ওরা বলছিল, আমরা তাঁকে চিনি, আমাদের কাছে তাঁর কথা শোন। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এরা কেউ ঐ পরিব্রাজককে কখনো দেখেনি, কেউ জানে না তিনি কবে এসেছিলেন, কি বলেছিলেন, আর কাকে বলেছিলেন

শের

১। মীরী মেঁ, গরীবী মেঁ, শাহী মেঁ, গুলামী মেঁ।
কুছ কাম নহী বনতা, বেজুরঅত-এ-রিন্দানা ॥
—রাজা বাদশাহ্ হলেই হ'ল না, নিজের স্বকীয়তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। মনের মধ্যে থাকবে দেশ ভক্তির উম্মাদক রস আর মত্ততা।

... ...

২। হজারোঁ সাল নর্গিস অপনী বেনূরী পে রোতী হ্যয়।
বড়ী মুশকিল সে হোতা হ্যয় চমন মে দীদাওর পয়দা ॥
—নিজের সৌন্দর্যহীনতার দুঃখে চিরন্তনী কান্না কেঁদে চলেছে নার্গিস ফুল, তার মধ্যেও যে অপরূপের প্রভাব আছে তা অনুভব করার মত প্রকৃত রসবেত্তার নাগাল পাওয়াই দুষ্কর।

... ...

৩। হুস্ন্ হো ক্যায়া খুদনুমা জব্ কোঈ মাইল হী ন হো।
শময় কো জলনে সে ক্যোয়া মতলব, জো মহ্ফিল হী ন হো ॥
—সৌন্দর্যের সার্থকতা কোথায় যদি কেউ তাকে উপলব্ধিই না করল, আলোর উজ্জ্বলতারই বা কি মর্ম যদি না সে সভাই উজ্জ্বল করল।

... ...

৪। ক্যোয়া ইশক্ এক জিন্দগী-এ-মুস্তয়ার কা।
ক্যোয়া ইশক্ পায়দার সে নাপায়দার কা ॥
—প্রেম কি কারুর কাছে চেয়ে চিন্তে পাওয়া যায়! প্রেমের অমরতা কোথায়! তাই যদি না থাকল তবে মিথ্যে এই প্রেম করতে যাই কেন।

৫। উয়ো ইশক্‌ জিসকী শময় বুঝা দে অজল কী ফুঁক।
উসমেঁ মজা নহীঁ তপিশো-ইন্তজার কা ॥
—যে প্রেমকে মৃত্যু এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিতে পারে, তার জন্য অসার প্রতীক্ষা বা অহরহ বিরহের কি প্রয়োজন !

... ...

৬। মেরী বিসাত ক্যেয়া হ্যয় তবো-তাবে-ইয়েক-নফ্‌স।
শোলা সে বেমহল হ্যয় উলঝনা শয়ার কা।
—আমার অস্তিত্ব তো সামন্য ঐ প্রাণ-স্পন্দনটুকু, যতক্ষণ ঐ প্রদীপের শিখা রয়েছে ততক্ষণই আমার স্থিতি।

... ...

৭। কর পহ্‌লে মুঝকো জিন্দগী-এ-জাবিদাঁ অতা।
ফির জৌক্‌-ও-শৌক দেখ দিলে-বেক্‌রার কা ॥
—আগে তো তুমি আমায় অমরতা দাও, তারপর দেখ ব্যর্থ প্রেমিকেব প্রেম জ্বালা।

... ...

৮। দিগরগুঁ হ্যয় জহাঁ তারোঁ কী গর্দিশ তেজ হ্যয় সাকী।
দিল হর জর্‌রা মেঁ গোগা-এ-রস্তাখেজ হ্যয় সাকী ॥
—তারাদের সভায় যেন প্রলয়ের ঢল নেমেছে, সেখানে বেচারা দিল-ও বেসামাল সাকী।

... ...

৯। মতা-এ-দীন-ও-দানিশ লুট গঈ অল্লাহ্‌ ওয়ালোঁ কী।
ইয়েহ্‌ কিস্‌ কাফির-অদা কা গমজহে-খুঁরেজ হ্যয় সাকী ॥
—ঐ দিল-এর হাল দেখে ধর্মের ধ্বজাদের বুদ্ধিও লোপ পেল। ওহে সাকী বলতে পার এ কোন নিখাদ সুন্দরীর রক্তক্ষয়ী কটাক্ষ !

১০। উয়োহী দেরীনা বীমারী, উয়োহী নামহকমী দিল কী।
ইলাজ উসকা উয়োহী আবে-নিশাত-অংগেজ হ্যয় সাকী॥
—এ সেই প্ররাতন রোগ, হৃদয়ের দ্র্বলতা। এর একমাত্র ওষ্ধ হ'ল সেই আনন্দদায়ক জল সিঞ্চন করা।

... ...

১১। নহীঁ হ্যয় নাউমীদ 'ইক্‌বাল' অপনী কিশ্তে-বীরাঁ সে।
জরা নম হো তো ইয়েহ্‌ মিট্টী বড়ী জরখেজ হ্যয় সাকী॥
—'ইক্‌বাল'-ও হাল ছাড়ার পাত্র নয় সাকী। প্রেম যদি হয় এক অকর্ষিত জমি তবে তাতেও সে ফসল ফলিয়ে ছাড়বে।

... ...

১২। হো মেরে দম সে ইউঁহী মেরে বতন কী জীনত।
জিস তরহ ফ্ল সে হোতী হ্যয় চমন কী জীনত॥
—আমার স্বকীয় চেষ্টায় আমি যেন আমার দেশকে এমনই স্ন্দর করতে পারি যেমন করে ফ্ল বিকশিত হয়ে বাগানকে সৌন্দর্য দেয়।

রুবাই

১। খিরদ্‌ ওয়াকিফ্‌ নহী হ্যায় নেকো-বদ্‌ সে।
বঢ়ী জাতী হ্যায় জালিম অপনী হদ্‌ সে॥
খুদা জানে মুঝে ক্যোয়া হো গয়া হ্যায়।
খিরদ্‌ বেজার দিল্‌ সে ম্যায় খিরদ সে।
—বুদ্ধি আর বিবেচনাতে মিল হয় না, তাই আমিও পথ ছেড়ে বিপথে চলেছি। খুদা জানেন আমার কি হয়েছে। আমি বুদ্ধির কথা মানছি না, কারণ বুদ্ধি যে বিবেকের কথা শুনছে না।

... ...

২। ইন্তিহা ভী ইস্‌কী হ্যায় আখির খরীদে কব তলক্‌।
ছতরিয়াঁ, রুমাল, মফলর, পৈরহন, জাপান সে॥
অপনী গফ্‌লত কী ইয়েহী হালত অগর কায়েম রহী।
আয়েঙ্গে গস্‌সাল্‌ কাবুল সে, কফন জাপান সে॥
—এর কি কোন সীমা আছে যে কতদিন আমি বাইরের জিনিস কিনতে পারব! ছাতা, রুমাল, মফলর, পিরান জাপান থেকে! নিজের লাপরওয়াই যদি এই রকম বাড়িয়ে চলি, এরপর তাহলে আমার শব ধোয়ার লোক আনতে হবে কাবুল থেকে আর কফিন জাপান থেকে।

... ...

৩। ম্যয় নবায়ে শোখতা দরগলুম্ ।
তু পরিহিদা রংগ্ রবিদা বু ।
মৈ হিকায়তে গমে আরজু ।
তু হদিসে মাতমে দিলবরি ।।

—আমার আওয়াজ গলার বাইরে আসার আগেই থেমে যায়। আর তোমার সারা বিশ্বে লীলা অবিরাম, অবিরত সুগন্ধে মাতোয়ারা। আমার তো একটাই দুঃখ প্রভু যে সব সময় তোমার কাছে আমার যাচনা করতে হয়। তুমি তো কখনোই খেয়াল কর না আমার কি চাই বা না চাই।

... ...

৪। বিঠা কে অর্শ পে রক্খা হ্যয় তুনে ইয়ে বাইজ্ ।
খুদা উয়ো ক্যেয়া হ্যয় জো বন্দোঁ সে এহতরাজ করে ॥
মেরী নিগাহ মেঁ উয়ো রিন্দ হী নহী সাকী ।
জো হোশিয়ারী-ও-মস্তী মেঁ ইম্তিয়াজ করে ।।

—ওহে উপদেশক এ তোমার কি রকম ধার্মিকতা যে ভক্তকে খুদার থেকে আলাদা করছ। খুদা তো মোটেই এ রকম নয়! আমার চোখে সে মাতালই নয় যে হুঁসিয়ারী আর নেশার পার্থক্য খুঁজে পাবে না!

নজ্‌ম্

(১) হকীকতে হুস্ন (সৌন্দর্যের নিত্যতা)

খুদা সে হুস্ন নে ইক রোজ ইয়েহ্ সওয়াল কিয়া।
জহাঁ ম্যাঁয় কিঁউ ন মুঝে তুনে লাজবাল কিয়া ?
মিলা জবাব কি তস্‌বীরখানা হ্যায় দুনিয়া॥
শবে-দরাজ অদম কা ফসানা হ্যায় দুনিয়া।
হুঈ হ্যায় রংগে-তগয়্যুর সে জব নমূদ ইস কী॥
উওহী হঁসী হ্যায় হকীকত জবাল হ্যায় জিস কী।
কঁহী করীব থা ইয়ে গুফ্‌তগু কমর নে সুনী॥
ফলক পে আম হুঈ অখ্‌তরে-সহর নে সুনী।
সহর নে তারে সে সুনকর সুনাঈ শবনম কো।
ফলক কী বাত বতা দী জমী কে মহরম কো॥
ফির আয়ে ফুল কে আঁসু পয়ামে-শবনম সে।
কলী কা নন্‌হা সা দিল খুন হো গয়া গম সে॥
চমন সে রোতা হুয়া মৌসমে-বহার গয়া।
শবাব সৈর কো আয়া থা, সোগবার গয়া॥

—একদিন সৌন্দর্য উত্যক্ত হয়ে খুদার দরবারে গিয়ে আর্জি পেশ করে বলল—এ তোমার কেমন রীতি, শুধু ভাঙছ আর গড়ছ। যার মধ্যে আমার জ্যোতি প্রকাশিত হচ্ছে কেন তুমি তাকে অমরতা দিচ্ছ না ! খুদা বললেন—পৃথিবী তো এক চিত্রশালা, প্রভাতের রূপ পায় সন্ধ্যায় লয়। জন্ম আর মৃত্যু এই দুই দ্বার দিয়ে ক্রমানয়ে ছবির পর ছবির মিছিল ঘুরে চলেছে সেখানে। এই শুরু আর সারা, নিরন্তর এই পরিবর্তনশীলতা আহ্নিক গতিতে এমনি লয় হচ্ছে বলেই তো তোমার সৌন্দর্যের

উৎকর্ষ আরও আকর্ষণীয় হচ্ছে। আর সেই অস্থায়িত্বের অমোঘ বিলীনতাই তো তাকে করে তুলছে অমূল্য। আকাশের চাঁদ সেখানে ছিল, সে এই আলোচনা শুনে অস্ত যাবার আগে সারা আকাশে তা রটিয়ে দিল। ভোরের তারা মারফত শুনল সূর্য, সে অস্ত যাবার আগে বলে গেল কুয়াশাকে। কুয়াশা থেকে শিশিরের মারফত সে খবর নেমে এলো পৃথিবীতে। ফুল তাই ঝরে যাবার আগে ঢেলে দিল তার অশ্রুনীর শিশিরের কণায়। আবার কলির ছোট্ট প্রাণটুকু এমনি পরিণামের কথা মনে করেই বেদনায় রক্তাক্ত হয়ে উঠল। সমস্ত ফুল বাগানে বাহার দিয়ে বসেছিল বসন্ত ঋতু, সেও উদাস হয়ে গেল কেননা তারও বাতাসে লেগেছে বিদায়ের মর্মরিত সুর।

(২) সাকী

নশা পিলা কে গিরানা তো সব কো আতা হ্যয়।
মজা তো জব্ হ্যয় কি গিরতোঁ কো থাম লে সাকী॥
জো ওয়াদাকশ্ থে পুরানে উয়ো উঠতে জাতে হ্যয়।
কহীঁ সে আবে-বকা-এ-দওয়াম লে সাকী,॥
কটী হ্যয় রাত তো হঙ্গমা-গুস্তরী মেঁ তোরি।
সহর করীব হ্যয় অল্লাহ্ কা নাম লে সাকী।

—নেশা করিয়ে মাতাল করে মজা দেখতে তো সবাই পারে সাকী। কিন্তু আসল মজা তো যে টলে পড়ছে তাকে তুলে ধরায়। রাতভর যারা তোমার কাছে অনেক রকম প্রতিজ্ঞা করেছিল তারা তো এবার রাত পোহাতেই যে যার মত ফিরে চলল। জীবনভোর তো শুধু শরাবই পান করালে সাকী, দিন তো ফুরিয়ে এলো এবার না হয় আল্লাহ্‌র নাম একটু নাও।

গজল

(১) তরানা-এ-হিন্দী

সারে জঁহা সে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা।
হম বুলবুলেঁ হ্যায় ইসকী ইয়ে গুলিস্তাঁ হমারা ॥
গুরবত মেঁ হোঁ অগর হম, রহতা হ্যায় দিল বতন মেঁ।
সমঝো উয়োহীঁ হমেঁ ভী দিল হো জহাঁ হমারা ॥
পরবত উয়ো সব সে উঁচা হমসায়া আস্মাঁ কা।
উয়ো সন্ত্রী হমারা, উয়ো পাসবাঁ হমারা ॥
গোদী মেঁ খেলতী হ্যায় ইসকী হজারোঁ নদিয়াঁ।
গুলশন হ্যায় জিনকে দম সে রস্কে-জনাঁ হমারা ॥
ইয়ে আবে রোঁদে গঙ্গা! উয়ো দিন হ্যায় ইয়াদ তুঝকো।
উতরা তেরে কিনারে জব কারওয়াঁ হমারা ॥
মজহব নহীঁ সিখাতা আপস মেঁ বৈর রখনা।
হিন্দী হ্যায় হম, বতন হ্যায় হিন্দোস্তাঁ হমারা ॥
ইয়ুনান-ও-মিস্র-ও-রোমা সব মিট গয়ে জহাঁ সে।
অব তক মগর হ্যায় বাকী নামো-নিশাঁ হমারা ॥
কুছ বাত হ্যায় কি হস্তী মিটতী নহীঁ হমারী।
সদিয়োঁ রহা হ্যায় দুশমন দৌরে-জমা হমারা ॥
'ইকবাল'! কোঈ মহরম অপনা নহী জহাঁ মেঁ।
মালুম ক্যোয়া কিসী কো দর্দ-নিহাঁ হমারা ॥

—এই হিন্দুস্তান আমার সর্ব দেশের সেরা। আমরা সব বুলবুল আর এ হ'ল আমাদের স্বর্গোদ্যান। আমি বিদেশে থাকলেও আমার মনের মধ্যে এই স্বদেশ হিল্লোল তোলে। এখানে স্বর্গে মাথা ঠেকিয়ে সান্ত্রীর মত পাহারাদারি করছে আকাশের

প্রতিবেশী ঐ বিশাল উঁচু হিমালয়। এই হিমালয়ই আমার রক্ষক, আমার পাহারাদার। হিমালয়ের বুকে কত নদী খেলা করছে। এর কোলে রয়েছে রমণীয় উদ্যান যা কি না স্বর্গেরও ঈর্ষার পাত্র। হে প্রবাহিনী গঙ্গা তোমার কি মনে পড়ে সেই দিন যে দিন তোমার তীরে নোঙ্গর করেছিলাম! ধর্ম কখনো নিজেদের মধ্যে শত্রুতা বা বিভেদের শিক্ষা দেয় না। একমাত্র সত্য হ'ল আমার দেশ হিন্দুস্তান আর আমি হিন্দুস্তানী। আমার এই মহান দেশের কাছে গ্রীস, ইউরোপ, মিশর, রোম সব মিথ্যে হয়ে যায়। নিশ্চয়ই কোন গভীর কারণ আছে যার জন্য অমার অস্তিত্ব আজও বজায় রয়েছে। হায় ইক্‌বাল! তোমার যে কোনো বিশ্বস্ত বন্ধু নেই যার কাছে বলে তুমি জ্বালা জুড়োবে।

... ...

(২) চাঁদ

মেরে বীরানে সে কোসোঁ দূর হ্যায় তেরা বতন।
হ্যায় মগর দরিয়া-এ-দিল তেরী কশিশ সে মৌজ্জন॥
কস্‌দ্ কিস্ মহফিল কা হ্যায়? আতা হ্যায় কিস্ মহফিল সে তু?
জর্দ-রু শায়দ হুয়া রঞ্জে-রহে-মঞ্জিল্ সে তু॥
আফ্‌রীনশ সে সরাপা নূর তু, জুলমত্ হুঁ ম্যাঁয়।
ইস্ সিয়াহ-রোজী পে লেকিন তেরা হম-কিস্মত হুঁ ম্যাঁয়॥
এক হল্‌কে পর অগর কায়ম তেরী রফ্‌তার হ্যায়।
মেরী গর্দিশ ভী মিসালে-গর্দিশে-পরকার হ্যায়॥
জিন্দগী কী রহ মেঁ সরগরদাঁ হ্যায় তু, হ্যয়রাঁ হুঁ ম্যাঁয়।
তু ফরোজাঁ মহ্‌ফিলে-হস্তী মেঁ হ্যায়, সোজাঁ হুঁ ম্যাঁয়॥

ম্যয় রহে-মঞ্জিল মেঁ হুঁ, তু ভী রহে-মঞ্জিল মেঁ হ্যয় ।
তেরী মহফিল মেঁ জো খামোশী হ্যয়, মেরে দিল্‌ মেঁ হ্যয় ॥
তু তলব-খুঁ হ্যয় তো মেরা ভী ইয়েহী দস্তুর হ্যয় ।
চাঁদনী হ্যয় নূর তেরা, ইশ্‌ক্‌ মেরা নূর হ্যয় ॥
অঞ্জুমন হ্যয় এক মেরী ভী জহাঁ রহতা হুঁ ম্যয় ।
বজ্‌ম্‌ মেঁ অপনী অগর ইয়ক্‌তা হ্যয় তু, তন্‌হাঁ হুঁ ম্যঁয় ॥
মেহর কা পরতৌ তেরে হক্‌ মেঁ হ্যয় পয়গামে-অজল ।
মহব কর দেতা হ্যয় মুঝকো জলওয়া-এ-হুস্নে-অজল ॥
ফির ভী ইয়ে মাহে-মুবী ! ম্যঁয় ঔর হুঁ তু ঔর হ্যয় ।
দর্দ জিস্‌ পহলু মেঁ উঠতা হো উয়ো পহলু ঔর হ্যয় ॥
গরচে ম্যঁয় জুল্‌মত-সরাপা হুঁ, সরাপা নূর তু ।
সয়কড়োঁ মঞ্জিল হ্যয় জোকে-আগহী সে দূর তু ॥
জো মেরী হস্তী কা মক্‌সদ হ্যয় তুঝে মালুম হ্যয় ।
ইয়ে চমক উয়ো হ্যয়, জবী জিস্‌ সে তেরী মহরূম হ্যয় ॥
—আমার আবাস থেকে বহু কোশ দূরে তোমার বাস ।
তবু আমার হৃদয় সাগরে তোমারই আকর্ষণ তরঙ্গ তোলে ।
তুমিও কী পথ পরিক্রমায় আমারই মত ক্লান্ত ?
তাই কি তোমার মুখছবি অমন ম্লান নিষ্প্রভ !
সৃষ্টির আদিকাল থেকে তুমি জ্যোতির্ময়ী আর আমি অন্ধকার ।
দেখে মনে হচ্ছে তোমার আর আমার ভাগ্যচক্র বোধহয় এক ।
তোমার চক্রপথ তুমি নিশ্চিন্তে পরিক্রমা করছ, আর আমি ?
অশান্ত হৃদয়ে নিজের ভাগ্যচক্রে ঘুরে মরছি ।
তুমি চন্দ্রলোকে থেকে যে কিরণ বিকীরণ করছ, আমি তাতেই
আকর্ষিত হয়ে পুড়ে যাচ্ছি, তবু তোমার ছবি বুকে ধরে আছি ।
ঐ কোন সুদূরে আছ তুমি আর আমি আছি মাটির বুকে,

তোমার সভায় যে স্তব্ধতা রয়েছে সেই নিরাশা ছেয়ে রয়েছে আমার মনে। তোমার মত আমিও প্রেম পিয়াসী,
তোমার সৌন্দর্য জ্যোৎস্নায় আর আমার ভালবাসাই ঐশ্বর্য।
তুমি তো তারাদের পরিষদ করে সুন্দর এক সভা সাজিয়েছ,
কিন্তু তোমার মত অদ্বিতীয় সভা আমার নেই, আমি নিঃসঙ্গ।
সূর্যোদয়ে তোমার লয় এই তোমার বিধিলিপি,
ঐ অনাদিকালের ছবিতে তুমি আমাকেও সঙ্গী কোরো।
প্রিয় চন্দ্রমা তবুও তুমি আর আমি যেন এক নই,
তোমার বেদনার ছায়া আমি বুকে ধরি, কিন্তু তুমি ?
হ্যাঁ আমি আঁধার তুমি আলো,
কিন্তু তোমার মধ্যেও রয়েছে অজ্ঞানতার কলঙ্ক।
বেদরদী চাঁদ তোমার ঐ কঠিন স্ফটিক জ্যোৎস্নায় কোন বেদনা বাজেনা, শুধু এক মিথ্যে আলোর অলীক মায়ায় বিভ্রান্ত করে উদ্‌ভ্রান্ত করছ তুমি।

জিগর মুরাদাবাদী

জিগর মুরাদাবাদী ছিলেন সরল স্বভাবের সহজিয়া ভাবের কবি। জন্ম বেনারসে ১৮৯০ সালে, মৌলভী খানদানী-বংশে। পুরো নাম ছিল আলি সিকন্দর। 'জিগর' ছিল এঁর পেন-নেম। মুরাদাবাদ থেকে এঁর কবি প্রসিদ্ধি তাই নিজের নামের সঙ্গে মুরাদাবাদ জুড়ে নিজে হয়েছেন জিগর মুরাদাবাদী। 'জিগর' মানে হৃদয়। পূর্বপুরুষের বাস ছিল দিল্লীতে। কবির প্রপিতামহ মুহম্মদ সমীয়ূ ছিলেন শাহ্‌জাদা শাহ্‌জাহাঁর গৃহ-শিক্ষক। কিন্তু কোন কারণে শাহ্‌জাদার সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে তিনি দিল্লী ছেড়ে চলে আসেন। সেই সময় এঁদের পরিবার দু'ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ চলে যায় আজমপুর, বিহারে আর অন্য অংশ গিয়ে বসে মুরাদাবাদে। আস্তে আস্তে মুরাদাবাদে এঁরা প্রতিষ্ঠিত বড়লোক হয়ে ওঠেন এবং অনেক সম্পত্তি করেন। কবির জন্মের সময় পিতা মৌলবী অলিনজর বেনারসে এক নবাবের কাছে চাকরি করতেন। কিন্তু জিগর যখন মাত্র ছ'মাসের তখন সেই চাকরি ছেড়ে তিনি মুরাদাবাদ চলে আসেন। কয়েক বছরের মধ্যেই পারিবারিক কারণে এঁদের অবস্থা চরমে ওঠে। সেই কারণে এঁর লেখাপড়াও বেশীদূর এগোয়নি। উর্দু ও ফারসী জানতেন, ইংরেজি জানতেন সামান্যই। কিন্তু ভাবের গভীরতায় উপলব্ধির অপরিমেয়তায় ভরা যাঁর হৃদয় তাঁর কবি হতে বাধা কোথায়!

জিগর মুরাদাবাদীর বাবা এবং দাদামশাই দু'জনেই শায়র ছিলেন। সেই পরিবেশে বড় হয়ে তের চোদ্দ বছর বয়স থেকেই তিনি কবিতা

লিখতে শ্রু করেন। তখন থেকেই তাঁর প্রতিভা বিকাশ পায়। বলে না দিলে কেউ ব্ঝতই না যে অমনি গভীর ভাবের কবিতাকৃতি এক কিশোরের। প্রথম দিকে উনি কবি 'দাগ'-এর কিছ্ সহায়তা নিয়েছেন পরে ওঁর বাবা ওঁকে পরামর্শ দিয়েছেন। তারপর নিজেই সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। এঁর গজলও পরম্পরাগত ছিল না। অপার কল্পনাশক্তি আর প্রাণশক্তিতে ভরপ্র এঁর কাব্যকলা। সবাই এঁকে বলত গজলের 'বাদশাহ্'।

জিগর মান্ষটি মোটেই স্শ্রী ছিলেন না কিন্তু তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্যে তাঁকে অপ্র্ব স্ন্দর লাগত। ম্শায়েরাতে যখন ব্কে একটা হাত রেখে চোখ বন্ধ করে গলা খ্লে তরন্ন্মের সঙ্গে গজল গাইতেন, মান্ষ তখন শ্নতে শ্নতে বিভোর হয়ে যেত। উনি এলেই ম্শায়েরাতে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হত। রাত রাত ভর যা বলে যেতেন তা তাঁর মনেও থাকত। লেখার সময় ঐ লাইনগ্লিই ঠিক ঠিক বসাতেন, একট্ও এধার ওধার হত না। ইনি ছিলেন স্ন্দরের প্জারী আর প্রেমের কবি। ভগবত প্রেম আর মান্ষের প্রেম দ্য়েতেই তাঁর ছিল সমান আসক্তি। তিনি বলতেন যা সত্য, যা ধ্রব, তাই ধর্ম। প্রেমই তো হ'ল ভগবত পথে যাবার প্রথম সোপান। বলতেন, মান্ষকে ভালবাসলেই তাঁকে ভালবাসা হয়, কেননা মান্ষ তাঁরই শ্রেষ্ঠ স্ষ্টি। স্রা, নারী আর ভগবত-প্রেম সবেতেই ছিল তাঁর দার্ণ আসক্তি আর আনন্দ। বলতেন, মৃত্যুতেই কি আমার এই প্রচণ্ড লিপ্সার লয় হবে? নিজের এই জিজ্ঞাসার জবাবে লিখেছেন একটি র্বাই—

গর চশমে আরজ্ কী হালত ইয়েহী রহেগী,
পর্দে মেঁ ভী কিসী কী বেপর্দগী রহেগী।
তুম খাক্ মেঁ মিলা দো দিল কো, জিগর কো লেকিন,
অরমাঁ ইয়েহী রহেঙ্গে, হস্রত ইয়েহী রহেগী।

—তুমি যতই বাধার সৃষ্টি কর, আমার প্রখর দৃষ্টিশক্তি দিয়ে সব বেপর্দা করে দেবো, যতই কেননা হৃদয়টাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দাও তবু আমার আশা আকাংখা অভিলাষ লালসা সব এমনিই থাকবে।

মিলন, বিরহ, ভোগ সমস্ত রকম মানবিক সত্তাকেই তিনি নিয়ে গেছেন আধ্যাতিকতার আধারে। প্রমাণ করে দিয়েছেন মানুষের মাঝেই তাঁর বাস তাই সরল বিশ্বাসে সহজ কথায় মানবতার গান গেয়েছেন কবি। শুধু তাই নয়, দেশ বিভাগ আর মন্বন্তরও তাঁকে বিপুল-ভাবে নাড়া দিয়েছিল। লিখেছেন, আজকের দিনে যে শুধু কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে আর নিজেকে কবি বলে পরিচয় দেয় তার মত পাপী আর কেউ নেই।

মাত্র ষোল বছর বয়সে কবির পিতৃবিয়োগ হয়। তারপরই সংসারে নেমে আসে দারিদ্রের করাল ছায়া। ঠাটবাট বজায় রাখতে পিতা যে প্রচুর ঋন রেখে গিয়েছিলেন তা ও'র জানা ছিল না। তাই শেরোশায়রীর কল্পনার জগত থেকে একেবারে বাস্তবে পদার্পন। বাধ্য হয়ে ব্যবসা ধরলেন চশমার। তার দরুণ দেশে বিদেশে ঘুরতে হয়। সে সময় আগ্রায় 'বহিদন' নামে এক হরিণ নয়নার সঙ্গে একটু আসনাই হয়। পাগল হয়ে ওঠেন এর প্রেমে। কবিতাতেও সেই প্রেমের ধুন বেজে ওঠে। আবার প্রত্যাখ্যানের বেদনায় তাতে যুক্ত হয় বিরহের জ্বালা। মেয়েটি পরে নিজের ভুল বুঝতে পারে। শেষ পর্যন্ত বিবাহের বন্ধনে বাঁধা পড়েন দু'জনে। কবির প্রেম শতধারায় উৎসারিত হয়ে ওঠে। তাঁর এত আকাঙ্খিত বিবিকে কাছে পেয়ে তিনি যেন জন্নত পেয়ে গেলেন। আদরের তো অবধি নেই আবার হাসি মজাকও করতেন। বিবিকে রাগিয়ে দেবার জন্য ঠাকুর্দার একটি শের প্রায়ই আওড়াতেন—

লুতফে্‌ জানাঁ রফ্‌তঃ-রফ্‌তঃ আফ্‌তে জাঁ হো গয়া,
অব্রে-রহমত ইস্‌ তরহ বরসা কি তুফাঁ হো গয়া।
—প্রিয়ার প্রনয় বাড়তে বাড়তে প্রাণ সঙ্কটে পৌছে দিল,
এমনই বর্ষা শুরু হ'ল যে তুফান বইয়ে দিল।

ও'র বিবি দারুণ চটে যেতেন আর উনি দিল্‌ খুলে হাসতেন।

ইতিমধ্যে ওনার নামও হয়েছে। ১৯২১-২২এ প্রথম কব্য-সংকলন 'দাগ-এ-জিগর' প্রকাশিত হয়। মুশায়েরাতেও তখন ও'র বেশ নাম ও দাম। কিন্তু খ্যাতির উচ্চ চূড়ায় পৌঁছেও নিজের দুরবস্থার কথা ভুলে যান নি, তাই তরুণ কবিদের সর্বদাই সাহয্য করতেন।

ওঁদের এই নির্মল সুখের জীবন বেশীদিন খুদা মঞ্জুর করলেন না। অকালে ঝরে গেল কবির পেয়ারী 'ব্‌হিদন'। এই বিরহের আঘাতে এরপর শুরু হল ওঁর লেখায় ক্ষোভ দুঃখ আর শোকের জ্বালা। শুরু করলেন মদ খেতে। শরাবে ডুবে থাকতেন। সোডা বা জল ছাড়া নীট মদ খেতেন আর কবিতা লিখে যেতেন। যার মধ্যে তাঁর প্রিয়ার একটু-খানি ছায়া দেখতেন তার কাছেই ছুটে যেতেন। কিন্তু মন তাঁর সেই অন্তর্জ্বালার অশান্ততায় থাকত অস্থির। সেই সময় সিরাজ বাঈ নামে একজন নাম করা তয়ায়েফ এসে ওঁকে নিজের কাছে নিয়ে যায়। সে বুঝেছিল ওঁর সৃষ্টির গভীরতা। যথন যেখানে মুজরোতে যেত সে ও'রই গজল গাইত। তাতে ও'র নাম আরও ছড়িয়ে পড়ল। প্রচুর টাকাও আসতে লাগল। বাঈজী তার সেবা দিয়ে দেহ দিয়ে ঘিরে রাখতে চাইল ও'কে। এ যেন শরৎবাবুর সেই দেবদাস আর চন্দ্রমুখীর ঘটনা। কিন্তু ছাই চাপা দিলেই কি আগুনের তাপ আর জ্যোতি ঢেকে রাখা যায়! ও'র জ্বলন্ত হৃদয়ে এ যেন একটু আশার আলো। কবি সিরাজকে বলতেন 'তুর'। আবার বলতেন, তুমি তয়ায়েফ, ছলা কলা তোমার পেশা, তুমি আমার সঙ্গেও তাই ভালবাসার অভিনয় করছ।

বাঈজী ও'কে সত্যিই ভালবেসেছিল, তাছাড়া কবির খ্যাতির মূলে এরও অবদান কিছু কম ছিল না। তাই তিনি কখনও অসম্মান করেননি একে।

এর মধ্যে কবির আরও বই ছাপা হয়ে গিয়েছে। যেমন—জজবাতে জিগর (জিগরের অনুভূতি)। বারদাতে জিগর (জিগরের জীবনের উপলব্ধি)। আবার ও'র 'শোলা-এ-তূর' (আগুনের ঝলক) বইখানিও আলিগড় ইউনিভার্সিটি থেকে এই সময় প্রকাশিত হয়। অল ইণ্ডিয়া রেডিও, লখ্নৌ স্টেসন থেকেও ডাক আসে। এবার ঐ শরাবের মত্ততাই ও'কে মাতালো। এ যেন সেই রামপ্রসাদের—'আমি মদে মাতাল নই গো, শ্যামা নামে মাতাল হই—'। সেই রকম ইনিও অন্য এক মদে মত্ত থাকতেন, বলতেন—আরে আমি কি আর এমনি এমনি মদ খাই! খুদ খুদাকে সঙ্গ দেবার জন্যই যে আমি পান করি, না হলে আমি কি আর এত মদ একলা খেতে পারি! ও'র 'শিকস্তে তোবা' নজ্‌ম্‌টি এই ভাবেরই প্রতিক।

এমনি যখন অবস্থা তখন ব্যবসার খাতিরে জিগর একবার গোঁড়া শহরে যান। সেখানে ও'র এক পুরোনো বন্ধু কবি আস্‌গর সাহেবের সংগে দেখা হয়। আস্‌গর ও'র সব খবরই জানতেন। তিনি ছিলেন বড় উদার হৃদয় আর পবিত্র মনের মানুষ। উনি ও'কে নিয়ে গেলেন একেবারে নিজের অন্দরমহলে। সেখানে খানাপিনার সময় জিগর দেখলেন আস্‌গরের শালী নসীম বানুকে। দেখে যেন চমকে গেলেন। এ'র ডিলডৌল চুলের ভাব সবই যেন তাঁর প্রিয়া সেই বুহিদন-এর মত। তবে কথাবার্তা, আচার ব্যবহারে অনেক বেশী শালীনতা আর নম্রতা রয়েছে। প্রথম নজরেই সে ও'র মন টেনেছে। এরপর প্রায়ই তিনি আস্‌গরের ওখানে যান। আস্‌গরের পবিত্র প্রভাবে তিনি যেন নিজের মধ্যেই পরিবর্তন অনুভব করেন। সেই সময়

আসগরের গুণগান করে প্রচুর শের আর রুবাই লেখেন, অনেকটা শেক্সপীয়ারের সনেটের ধরণে।

বন্ধু আসগরের পবিত্র জীবনের ধারা তাঁরও ধাঁচা পাল্টে দিল। ধীরে ধীরে বদলে গেলেন তিনি। সিরাজির স্বপ্ন-মহল থেকে বেরিয়ে বাস্তবানুগ হলেন। ততদিনে নসীম বানুরও দিল্-এ দোলা লেগেছে। কিন্তু ও'র অত মদ খাওয়া নসীমের বরদাস্ত নয় তাই উনি ওয়াদা করলেন যে ধীরে ধীরে মদ ছেড়ে দেবেন! বিয়ে হয়ে গেল। আবার আনন্দের জোয়ার এল কবির জীবনে। লেখাতেও বাজল তার সাড়া। বিবিকে নিয়ে হজ করতে গেলেন। হাজী জিগরের কাব্যে পড়ল ভগবত অনভূতির চেতনা রস। এতদিনে তাঁর আরও কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে। কবিখ্যাতিও বেড়েছে। এই সময় সাহিত্য অ্যাকাডেমি থেকে তাঁর 'আতশে গুল' বইটির জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা পান। কিন্তু ঐ এক মদেই সব টাকা ফুঁকে যায়। মদ উনি ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারেন না। প্রতিজ্ঞা করেও রাখতে পারেন না। এদিকে অভাব অনটনের দরুণ সংসার চলা দায়। লেপ আছে কিন্তু এত পুরনো যে তার ওপরের কাপড়ই নেই, শুধু তুলো। মুরদাবাদের ঐ প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও নসীম বেগম কোন ওজর তোলেন না, যতটা সম্ভব দুঃখ কষ্ট সইতে থাকেন। আসগরের সংসারে এইভাবে চলাই তিনি শিখেছেন। কিন্তু স্বাস্থ রক্ষার জন্যও যে ও'র মদ ছাড়া জরুরী, এই মাত্রাতিরিক্ত পান যে সর্বনাশ করবে ও'র। তাই মদ ছাড়াবার জন্য আসগর আর নসীম মিলে পরামর্শ করলেন যে ও'কে ভালমত আঘাত দিতে হবে তবেই হয়তো মদ ছাড়বেন!

বিপত্নিক আসগর, নসীমকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন। অপরাধের তুলনায় আঘাতটা একটু বেশীই হল। মদ তিনি একেবারেই ছেড়ে

দিলেন। কিন্তু সইতে পারলেন না, অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নসীমের শোকে তখন তিনি মরিয়া। ডাক্তারের হাজার অনুরোধেও এক ঢোক মদও তিনি গেলেন না। লিখলেন—

জানকর মিনজুম্লয়ে খাসানে ময়খানঃ মুঝে,
মুদ্দতোঁ রোয়া করেংগে জামো পয়মানঃ মুঝে।
—মরণ যখন টানবে ইতি, তখনও এই শরাবখানা
কাঁদবে আমার জন্য আর কাঁদবে ঐ পাত্রখানা।

খাওয়া দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। ছোট ভাই এসে কাছে রয়েছে। সে-ই দেখাশুনো করে। কিন্তু নসীম আর থাকতে পারলেন না, আবার ফিরে এলেন ওঁর কাছে। ঐ আস্‌গর আলীই আবার নসীম-এর সঙ্গে দ্বিতীয়বার তাঁর বিয়ে দেন। এই হারিয়ে পাওয়ার আনন্দ তাঁর অত বড় হৃদয়েও ধরল না। একেবারে শয্যা নিলেন। বললেন, বড় দেরি হয়ে গেল।

তাঁর মৃত্যুর আগমন বার্তা আগে থেকেই তিনি জানতে পেরেছিলেন। লিখেছেন—

করীব মঞ্জিলে আখির হ্যায় অলফিরাক্ 'জিগর',
সফর তমাম হুয়া, নীদ আঈ জাতী হ্যায়।
— জিগর', এবার যে গন্তব্যে পৌঁছে গেছ,
সফর তো অনেক হ'ল, এবার শেষ ঘুম নেমে আসছে।

বন্ধু হাকিম আবদুল বারী অনসরীকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, তুমিই আমার শবকে স্নান করাবে। মৃত্যুর দিন ভোরে উঠে ছোট ভাইকে বলেন, কাউকে বিরক্ত না করে আমায় একটু চা করে এনে দাও। বেলা ন'টা দশটার বেশী আর আমি থাকব না। সব শুনে কেঁদে পড়লেন নসীম। বন্ধু আস্‌গর সাহেব এলেন। উনি তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে অস্ফুটে বললেন, অলবিদা, অস্‌লাম পেয়ারে—

দিল কো সুকুন, রুহ্ কো আরাম আ গয়া,
মৌত আ গঈ কি দোস্ত্ কা পয়গাম আ গয়া।
—হৃদয়ের শান্তি আর আত্মার বিশ্রাম নিয়ে
মরণ আমার পরম বন্ধুর বেশে আসছে !

যেন রবীন্দ্রনাথের সেই—'মরণরে' তুহুঁ মম শ্যাম সমান—'। ফুরিয়ে গেল মহাপ্রাণ। জিগর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ১৯৬০ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বেলা দশটায় তাঁর প্রিয়া নসীম বেগমের কোলেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। বড় শান্তিতে মহাকবি মহাপ্রয়ানে চলে গেলেন।

শের

১। জিগর ম্যঁয়নে ছুপায়া লাখ অপনা দর্দ-এ-গম, লেকিন
বয়াঁ কর দি মেরী সুরত নে সব কৈফিয়তেঁ দিল্‌ কি।
—নিজের মনের দুঃখ অতি কষ্টে গোপন করেছিলাম,
কিন্তু আমার মুখের রং বদলই যে মনের কথা সব বলে দিল।

... ...

২। আঈ জব উনকী ইয়াদ তো আতী চলী গঈ,
হর নক্‌শে মাসিবা কো মিটাতী চলী গঈ।
—ওকে যখন আমার মনে পড়ল
তখন সাবা পারিপার্শ্বিক ভুলিয়ে দিল।

... ...

৩। ছুপ কে রহ্‌ নহী সক্‌তী আশিকী উয়োহ মস্তী হ্যায়,
দিল্‌ সে বাদল উঠতা হ্যায় আঁখ সে ময় বরস্‌তী হ্যায়।
—প্রেম কি লুকোনো যায়! মাতাল করে দেয় যে,
মনের মেঘ চোখের জল হয়ে মধু ঝরায়।

... ...

৪। নিগাহোঁ সে ছুপকর কহাঁ জাইয়েগা,
জহাঁ জাইয়েগা হমেঁ পাইয়েগা।
—আমার চোখের আড়ালে তুমি কোথায় লুকোবে!
যেখানে যাবে সেখানে যে আমাকেই পাবে।

... ...

৫। ম্যয় জহাঁ হুঁ তেরে খয়াল মেঁ হুঁ,
তু জহাঁ হ্যায় মেরী নিগাহ্‌ মেঁ হ্যায়।
—আমি আছি তোমার চিন্তায় বিভোর হয়ে
আর তুমি আছ আমার অনুভবে।

৬। হমসে পুছো উয়োহ্ কঁহা হ্যয় ঔর কিস্ মস্কন মেঁ হ্যয়,
দর্দ কী বেতাবিয়ো মেঁ কল্‌ব্ কী ধরকন মেঁ হ্যয়।
—আমায় জিজ্ঞেস কর না, সে কোথায় আছে আর কেমন আছে।
আছে আমার বেদনার্ত হৃদয়ে আর ঐকান্তিক কামনায়।

... ...

৭। মুহব্বত্ নে উসে আগোশ মেঁ ভী পা লিয়া আখির,
তসব্বুর হী মেঁ রহ্‌তা থা জো ইক মহশর-খরাম আখির।
—জড়িয়ে ধরে আদর করলাম, বাস্তবে না কল্পনায়। এমনই তার প্রভাব যে পলকে প্রলয় এনে দিল।

... ...

৮। জিন্দা মেঁ তো মুঝকো ডাল দিয়া, ইয়ে হাকিমে জিন্দা তুনে মগর,
পর্বাজ জো মেরী রোক্ সকে, এইসি ভী কোঈ দীওয়ার উঠা।
—চতুর্দিকে নিষেধের পাঁচিল তুলে তো বন্দিখানা বানিয়েছ, কিন্তু এই দুর্মদ দিলটাকে বাধা দেবার মত কোন কঠিন দেওয়াল তুলতে পেরেছ কি ?

. ...

৯। উয়োহ্ চেহ্‌রা হ্যয় পুরনূর কি অল্লাহ্ কী কুদরত,
উয়োহ্ আঁখ হ্যয় মখমুর কি 'হাফিজ' কী গজল হ্যয়।
—ঐ জ্যোতির্ময়ী রূপ, এ যেন আল্লার এক অপরূপ সৃষ্টি,
আহা! ঐ মদির কটাক্ষ যেন হাফিজের গজল।

... ...

১০। সে কে খত্ উনকা কিয়া জব্‌ত্ বহুত কুছ্ লেকিন,
থরথরাতে হুয়ে হাথোঁ নে ভরম খোল দিয়া।
—আরে আমি তো চুপ করেই ছিলাম, কিন্তু আমার হাতের কাঁপুনিই যে বুঝিয়ে দিল চিঠিখানায় কি আছে।

১১। ইন্সা হ্যয় জিন্দগী সে নালাঁ,
ইন্সা সে জিন্দগী পশেমাঁ।
—মানুষ জীবনে অসন্তুষ্ট, অপরিতৃপ্ত ;
জীবন মানুষের কাছে তাই সংশয়িত, লজ্জিত।

... ...

১২। মিলকে ভী জো কভী নহী মিলতা,
টুটকর দিল উসী সে মিলতা হ্যয়।
—যাকে সহজে পাওয়া যায় না, ভাঙ্গা মন যে
তাকেই চায়।

... ...

১৩। রংগে-হয়া হ্যয় ইয়েহ্ তেরে জোশে শবাব মেঁ,
ইয়া চাঁদনী কা ফুল খিলা হ্যয় গুলাব মেঁ।
—তোমার ঐ লজ্জার প্রকাশ, যেন ফুটন্ত গোলাপের ওপর
জ্যোৎস্নার আভাস।

... ...

১৪। আহ্! রো লেনে সে ভী কব বোঝ দিল কা কম হুয়া,
জব কিসী কী ইয়াদ আঈ ফির উয়োহী আলম হুয়া।
—আহা! কাঁদলে মনের বোঝা হালকা হয়, কিন্তু একবার
তার কথা মনে পড়লেই তো মনের ভার দ্বিগুন হয়।

... ...

১৫। বস্ এক নজরোঁ কা ধোকা হ্যয়, বস্ এক নজরোঁ কা পর্দঃ হ্যয়,
ন মজনু কোঈ মজনু হ্যয়, ন লয়লা কোঈ লয়লা হ্যয়।
—ব্যাস, শুধু একটি শুভদৃষ্টির অপেক্ষা। পলকে পর্দা সরে
গেলে তখন কে লায়লা আর কেইবা মজনু।

... ...

১৬। সিফাক্ চিত্‌বনে ভী হ্যায় কাতিল নজর ভী হ্যায়,
ক্যেয়া চীজ হো গয়ে হো তুমহেঁ কুছ খবর ভী হ্যায় ?
—রাগে চোখ লাল করে চেয়ে আছ, তিরস্কারের তীর মারছ,
তুমি যে কী হয়ে গেছ সে খবর রাখো ?

... ...

১৭। খুদ্ অপনে হুস্ন কী তাসীর কো উয়ো ক্যেয়া জানে,
তেরী নিগাহ হ্যায় জালিম মেরী নিগাহ নহীঁ।
—ওর রূপের আকর্ষন কতটা তা কি ও নিজে জানে!
তোমার ঐ কটাক্ষেরই দোষ, আমার দেখাটা দোষের নয়।

... ...

১৮। হ্যায় ময়াল কারে ফনা ইয়েহী কি উনহীঁ কা রঙ্গ অয়াঁ রহে,
ন নজর হমারী নজর রহে ন জুবাঁ হমারী জুবাঁ রহে।
—ও ওর নিজের রং-এ অমনিই রঙ্গীন হয়ে থাক,
বরং আমারই দৃষ্টি নিভে যাক, বাক রুদ্ধ হয়ে যাক।

... ...

১৯। মুঝে জো অর্জে তমন্না পে কুছ হিজাব আয়া,
মেরে সওয়াল কী শর্মিন্দগী সওয়াল হুঈ।
—আমার বাসনা তোমাকে জানাতে গিয়ে লজ্জায় মরে গেলাম,
ঐ লজ্জাই শেষে বাসনা হয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা তোমায় জানিয়ে দিল।

... ...

২০। শময় জব ফানুস মেঁ থী, আঁখ থী মহবে জমাল,
জব হুঈ উরিয়াঁ, নিগাহোঁ কো পরীশাঁ কর দিয়া।
—কল্পনার কল্পলোকে বিভোর হয়ে বিরাজ করছিলাম,
কিন্তু তোমার নিরাবরণ রূপ আমায় বিহ্বল করে দিল।

২১। ইয়েহী জমী তেরা মস্কন, ইয়েহী তেরা মদ্‌ফন্‌,
ইসী জমীন সে তু মেহ্‌রোঁ-মাহ পয়দা কর।
—এই পৃথিবী তোমারই সৃষ্টি এই জমি আমার পরিচিত,
এই মাটির বুকে এসে তুমি চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি কর।

... ...

২২। মঁায় উয়ো সাফ হী ন কহ্‌ দূ জো হ্যায় ফর্ক মুঝমেঁ তুঝমেঁ,
তেরা দর্দ দর্দে তন্‌হা, মেরা গম্‌ গমে জমানঃ।
—তোমার আমার তফাৎটা কোথায় না হয় স্পষ্ট করে বলেই দিই,
তুমি আছ তোমার নিঃসিম্‌ নিঃসঙ্গতায়, আর আমি
আছি নিরন্তর যুগবেদনায় বহমান।

... ...

২৩। জো ন কাবঃ মেঁ হ্যায় মহদূদ ন বুতখানে মেঁ,
ন হ্যায় উয়োহ্‌ ঔর এক উজড়ে হুয়ে কাশানে মেঁ।
—না আছ তুমি কাবাতে আর না আছ মন্দিরে,
কিম্বা ঐ পুরাতন গির্জা ঘরে।

... ...

২৪। ইধর সে ভী হ্যায় সিওয়া কুছ উধর কী মজবুরী,
কি হমনে আহ্‌ তো কী, উনসে আহ্‌ ভী ন হুঈ।
—কিছু আমার অসুবিধে, কিছু তোমার অপারগতা,
তবু তো আমি তোমায় আহা বলেছি, তুমি তো
কই সেটুকুও বললে না।

... ...

২৫। এক জামে আখরি তো পিনা হ্যয় ঔর সাকী,
ইয়া দস্তে শৌক কাঁপে ইয়া পয়ের লড়খড়ায়ে।
—আর এক গেলাশ মাত্র শরাবই তো চাইছি সাকী,
চায় হাতই কাঁপ্ক নয়তো পা-ই পড়্ক বেতালে।

....

২৬। দিল কি সকিস্তা সাজ সে নগমেঁ উবল পড়ে,
পুঁছা কিসিনে হাল তো আঁসু নিকল পড়ে।
—মনের মাঝে তুফান তোলে অভিমানে ভরা বাদল,
সমবেদনার পরশ পেলেই উথলে ওঠে চোখের জল।

... ...

২৭। ক্যেয়া ক্যেয়া খয়ালো বহ্ম নিগাহোঁ পে ছা গয়ে,
জো ধ্রক সে হো গয়া ইয়ে স্না জব উয়োহ্ আ গয়ে।
—সংশয়ে আর বিতর্কে বিভ্রান্ত হয়ে কত কিই ভাবছিলাম,
যেই তার আসার ইসারা পেলাম মনটা নিমেষে নির্মেঘ হয়ে গেল।

... ...

২৮। ন ঘবরা কসরতে গম হ্স্লে কামিয়াবি মেঁ,
কে ফ্ল আনে সে পহলে শাখ্ গ্ল্মে খার আতে হ্যয়।
—ভয় কি বল দহন জ্বালায়, শাখায় আগে কাঁটা আসে
ফ্ল ধরে সেই বেলা শেষে।

... ...

২৯। হম দম কমালে জন্নত্ কা আঞ্জাম কুছ ন পূছ,
কেয়া জানে কিতনে অশ্ক্ হ্যয় মেরে হঁসিকে সাথ।
—প্রিয়তমা, দেখেছ শুধুই হাসির ছটার ফুলঝুরি,
হাসির আড়ালে অশ্রুধারার দেখনি কি লুকোচুরি।

... ...

৩০। পাসে অদব সে ছুপ ন সকা রাজ ইশ্ক্ কা,
জিস জা তুমহারা নাম সুনা সর ঝুকা দিয়া।
—যেদিকে তোমার নাম শুনলাম, মাথা হেঁট করলাম, কিন্তু
এই শিষ্টাচার কি তোমার প্রতি আমার প্রেম লুকোতে পারল।

... ...

৩১। হদ্দে কূচা-এ-মহবুব হ্যয় উয়োহী সে শুরূ,
জহাঁ সে পড়নে লগে পাঁও, ডগমগায়ে হুয়ে।
—প্রিয়ার বাড়ীর গলি ঐখান থেকেই শুরু,
যেখানে গেলেই পা কাঁপতে থাকে।

... ...

৩২। হুস্ন কী হর-হর অদা পর জানো-দিল সদকে মগর,
লুৎফ্ কুছ দামন বচাকর হী গুজর জানে মেঁ হ্যয়।
—আমি তো রূপ দেখলেই পাগল হয়ে যাই, সঙ্গে সঙ্গে
তাতে আবিষ্ট হয়ে যাই; তাই রূপসীর কর্তব্য আঁচলে
মুখ ঢেকে চলা।

রুবাই

১। সুনানে চলে থে উন্‌হেঁ হালে দিল্,
নজর মিলতে হী রঙ্গ ফক্ হো গয়া।
জো কুছ বচ্ রহা থা মেরা খুনে দিল্,
উয়োহী আস্মাঁ পর শফক্ হো গয়া।
—মনের কথা বলতে গিয়ে বাক্য আমার হরে গেল,
নিরক্ত হয়ে গেলাম, হৃদয়ের রক্তিমা গিয়ে ঠাঁই নিল
আকাশের বুকে, হয়ে গেল ঊষার লালিমা।

... ...

২। ফনায়ে ইশক্ কো রংগে বকা দিয়া তুনে,
হয়াতো মৌত কো ইয়েকজা দিখা দিয়া তুনে।
হজার দিল্ কো মিটাকর দিয়া মুঝে ইক্ দর্দ,
ইস্ এক দর্দ কো ফির দিল বনা দিয়া তুনে।
—প্রেম বল আর প্রণয় বল, পেলাম শুধুই হলাহল,
মরণ জ্বালার যন্ত্রণা, নিবিড় অন্ধকার,
বেদনার নিষ্পেষণে হারিয়ে গেল হৃদয়,
ঐ বেদনাই শেষে জন্ম দিল আনকোরা এক জিগর।

... ...

৩। তু রাজে মুহব্বত কো সমঝা হী নহীঁ বর্না,
পাবন্দিয়ে ইন্সাঁ হী আজাদিয়ে ইন্সাঁ হ্যায়।
সদকে তেরে হোঁঠোঁ কী রংগীনী উয়ো রয়নাঈ,
ইয়েক মৌজে তবস্সুম মেঁ কুল রাজে গুলিস্তাঁ হ্যায়।
—প্রেমের রাজ্যে উল্টো নিয়ম তা জানো কী! বাঁধন যদি
শক্ত কর তবেই পাবে মুক্তি, তোমার ঐ হাসির ছটার ফুলঝুরি
নিমেষেই ফুটিয়ে দেবে গুলবাগানের ফুলকারি।

৪। শীশে সে ন রখ মতলব ইয়ে সাকিয়ে ময়খানঃ,
ইন মস্ত নিগাহোঁ সে ভর দে মেরা পয়মানঃ।
আ জায়ে অগর অপনী জিদ পর কোঈ দীবানঃ,
খুদ্ গির্দ ফিরে আকর কা'বা হো কি বুতখানঃ।
—ও শরাবখানার সাকী, পিয়ালার পরওয়া কোরোনা। আমার এই শরাবী চোখের কটাক্ষ দেখ আর শরাব ঢালতে যাও। এমনই মাতাল করে দাও যাতে দিক্বিদিকের জ্ঞান বা মসজিদ মন্দিরের ফারাক না থাকে।

নজ্‌ম্

১। তকল্লুফ সে, তসন্নী সে বরী হ্যয় শায়রী অপনী,
হকীকত্ শের মেঁ জো হ্যয়, উয়োহী হ্যয় জিন্দগী অপনী।
ইহাঁ তক জো 'জিগর' পহুঁচী হ্যয় মেরাজে খুদী অপনী,
কি হুস্ন ইক মশ্গলঃ অপনা হ্যয়, ইশ্ক ইক দিল্লগী অপনী।
ইসে সমঝে ন সমঝে কোঈ, লেকিন বাকয়া ইয়েহ্ হ্যয়,
কি তর্ক ময়কশী পর ভী উয়োহী হ্যয় ময়কশী অপনী।
—আমার কবিতায় না আছে ভান না ভাঁনতা আর না আছে লৌকিকতা। এ আমার অন্তরের অতলান্ত অনুভব। আমার জীবন যন্ত্রণার তন্তুতে তন্তুতে যা আমি ধ্রুব সত্য বলে জেনেছি, হৃদয় দিয়ে যা অনুভব করেছি, তাই আমি কবিতার আকারে সাজিয়েছি। একথা কেউ বুঝুক আর না বুঝুক আমি কিন্তু এই কাব্য মধুর মাদক রসের মদিরায় মেতে আছি।

২। ক্যেয়া হুস্ন নে সমঝা হ্যায় কোয়া ইশ্ক্ নে জানা হ্যায়,
হম খাকনশীনো কী ঠোকর মে জমানঃ হ্যায়।
হম ইশ্ক্ কে মারুকা অদনা ইয়ে ফিসানা হ্যায়,
সিমটে তো দিলে-আশিক ফয়লে তো জমানঃ হ্যায়।
ইয়ে ইশ্ক নহীঁ আসাঁ, বস্ ইত্না সমঝ লেনা,
ইয়ে আগ দরিয়া হ্যায়, ঔর ডুবকে জানা হ্যায়।
—হাসিনা হয়ে হাসছ শুধুই, দো'রোজা পেয়ার মূল্য কি তার,
মহব্বত নেই, দিল্ তো আছে, দিয়েছি তাকে এক্তিয়ার,
আমি এক প্রেমিক শায়র, বলছি শোন, সহজ নয় কো ঐ পেয়ার,
এ হল এক আগ্ দরিয়া, পাড়ি দিয়ে পার পাবে না,
ডুবে তোমায় যেতেই হবে, জ্বলতে হবে, জ্বালবে তবে
আশিক জনের দিল-এ দিয়া।

… … … … …

৩। পহিলে শরাব জীস্ত থী, অব্ জীস্ত হ্যায় শরাব।
গুদাজে ইশ্ক নঁহী কম জো মঁ্যয় জওয়াঁ ন রহা,
উয়োহী হ্যায় আগ মগর আগ মে ধুয়াঁ ন রহা।
'জিগর' আহ্ অঁজামো আগাজে উল্ফত,
সুকুত আখির-আখির ফুগাঁ অব্বল-অব্বল।
—এতকাল তো মেতে ছিলাম শরাবে, এখন আমার মন মজেছে জীবন সুরার শবাবে, জওয়ানী না হয় নিল বিদায়, তাই বলে কি প্রেম পালায়! প্রগাঢ় প্রেম মদনরসে জরে হয়েছে এখন শুক্তি, তারুণ্যের লয়ে অনাদি প্রেমের জয়, আছে আগুন না আছে শিখা, এই তো প্রেমের মুক্তি।

… … … … …

৪। শিকস্তে তৌবঃ (প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ)

সাকীকী হর নিগাহ পে বল খাকে পী গয়া,
লহরোঁ সে খেলতা হুয়া লহরাকে পী গয়া।
বেকৈফিয়োঁ কে কৈফ সে ঘবরাকে পী গয়া,
তৌবঃ কো তোড়-তাড়কে থররাকে পী গয়া।
জাহিদ। ইয়ে মেরী শোখিয়ে রিন্দানঃ দেখনা,
রহমত্ কো বাতোঁ-বাতোঁ মেঁ বহলাকে পী গয়া।
সরমস্তিয়ে অজল মুঝে জব ইয়াদ আ গঈ,
দুনিয়ায়ে এতবার কো ঠুকরাকে পী গয়া।
আজুর্দগীয়ে খাতিরে সাকী কো দেখ্‌কর,
মুঝকো উয়ো শর্ম আঈ, কি শর্মাকে পী গয়া।
এ রহমতে তমাম ! মেরী হর খতা মুয়াফ্,
ম্যাঁয় ইন্তিহায়ে শোক মেঁ ঘবরাকে পী গয়া।
পীতা বগৈর ইজ্‌ন্ ইয়ে কব থী মেরী মজাল,
দর পর্দঃ চশ্মে ইয়ার কী শহ্ পাকে পী গয়া।
উস জানে মৈকদঃ কী কসম, বারহা 'জিগর',
কুল আলমে বসীত পে ম্যাঁয় ছাকে পী গয়া।

—সাকীর কটাক্ষ করল আমায় শরাবী, সবুর পর সবু ঢেলেই চলেছি গলায়, যতই শরাব তলায় ততই বাড়ে ফুর্তি, তোবা ভুলে শিকস্ত ভুলে বাড়িয়ে চলি চুস্ত। ওহে সব উপদেশকরা, দেখেছ আমার বিহ্বলতা ? নেশার ঘোরে কি দেখছি জানো ? খুদ খুদাকেই যে কথায় কথায় মাতিয়ে রেখে মেতে উঠেছি মত্ততায়। আরে আমি তো চিরকেলে মাতাল, আমি কি জানি দুনিয়াদারীর হালচাল! আর সাকী! সেও কিনা লজ্জা

পাচ্ছে আমার সব্ ভরতে ! তার লজ্জা ঢাকতেই তো বাধ্য হ'লাম ফের গলা ভেজাতে ! অয় খুদা মাফ্ কর আমার সব দোষ। এই ময়খানার জান ঐ সাকীর কসম্ বলছি, আমি তো দেখছি তুমিই এই বিশ্বময় মধুশালা সাজিয়েছ ! তোমার মদির কটাক্ষের ইশারাতে আর তোমার সাথে সাথ দিতেই তো আমি এতক্ষণ ধরে পাত্রের পর পাত্র উজাড় করলাম।

... ...

৫। পরীন্দা (পোকা)

কভী শাখো-সব্জায়ো বর্গ পর, কভী গুঞ্চায়ো গুলো খার পর,
ম্যয় চমন মেঁ চাহে জহা রহুঁ, মেরা হক হ্যয় ফসলে বাহার পর।
মুঝে দে'ন গয়েজ নে ধমকিয়া, গিরে লাখবার ইয়ে বিজলিয়াঁ,
মেরী সল্তনত ইয়েহী আসিয়াঁ, মেরী মিলকীয়ত এহি চারপর।
আজব ইনকিলাবে জমানা হ্যয়, মেরা মুখ্তসর ফসানা হ্যয়,
এহিবার অব জো হ্যয় দোষপর, এহি সর থা জানুয়ে ইয়ার পর।

—আমি এক আজাদ পোকা, যেমন মর্জি তেমন থাকা, সে ফুল ফল আর ফসল কিম্বা শাক সব্জি বা জল, যেখানেই আমি থাকি না কেন, আমার হক্ আছে এই মাটির ওপর। যতই কেননা মেঘ ডাকুক, শতবার বজ্রপাত হোক, আমাকে ধমকি দিক, তবু এই মাটিতেই থাকবে আমার অবাধ রাজত্ব। এই-খানেই রয়েছে আমার সর্বসত্ত্ব. মুখ্য বুলিই আমার ইনকিলাব, এরপরে আমার শেষ আকঙ্খা প্রিয়ার বা বন্ধুর কোলে মাথা রেখে শান্তির মৃত্যু।

১। (ক) দিল্ মেঁ কিসী কে রাহ্ কিয়ে জা রহা হুঁ মৈঁয়।
কিতনা হঁসী গুণাহ্ কিয়ে জা রহা হুঁ মৈঁয়॥
ফর্দে-অমল সিয়াহ্ কিয়ে জা রহা হুঁ মৈঁয়।
রহমত কো বেপনাহ কিয়ে জা রহা হুঁ মৈঁয়॥
গুলশন-পরস্ত হুঁ মুঝে গুল হী নহীঁ অজীজ।
কাঁটো সে ভী নিবাহ্ কিয়ে জা রহা হুঁ মৈঁয়॥
ইঁয়ু জিন্দগী গুজার রহা হুঁ তেরে বগৈর।
জৈসে কোঈ গুনাহ্ কিয়ে জা রহা হুঁ মৈঁয়॥
—কালি ঢেলে দিয়ে কালো করে দিয়ে করে দিলাম একাকার।
যদি বল পাপ, পাপই করেছি, নেই কো এ চিতে কোন বিকার॥
তোমার পথ কেটেছি মনে, কেটেই চলেছে ক্ষুরের ধার।
পাপের পঙ্কে ডুবিয়েছি তাকে, যাকে বলা হয় কর্ণধার॥
নিজেই মজেছে তরাবে কি আমায়, কিম্বা করবে পঙ্কোদ্ধার।
বেপরোয়া আমি, বেহেস্ত্ রচেছি, ফুল দিয়ে নয়, শুধুই খার,
আরে তোমা বিনা শূন্য লাগে যে আমার,
মেনে তো নিয়েছি মাথা পেতে আমি, যতই বলনা গুনাহ্গার॥

... ...

(খ) হমে মালুম হ্যায় হম সে সুনো, মহশর মেঁ ক্যোয়া হোগা।
সব উস কো দেখতে হোঙ্গে উয়ো হমকো দেখতা হোগা॥
জহন্নুম হো কি জন্নত জো ভী হোগা ফয়সলা হোগা।
ইয়ে ক্যোয়া কম হ্যায় হমারা ঔর উনকা সামনা হোগা।
ইয়ে মানা ভেজ দেগা হম কো মহশর সে জহন্নুম মেঁ।

মগর জো দিল পে গুজরেগী উয়ো দিল হী জানতা হোগা ।।
সমঝতা ক্যেয়া হ্যয় তু দীওয়ানগানে-ইশ্‌ক কো জাহিদ ।
ইয়ে হো জায়েঙ্গে জিস জানিব উসী জানিব খুদা হোগা ॥
—আমিই জানি শেষের বাত্‌, অন্তে কি বা হবে !
সবাই তাকে দেখে, সে আমায় দেখছে হবে !
জাহাঁপনার জরীপে নয় জাহান্নমেই দেবে আমায়,
মরণ যে রে মরবে ভয়ে, থাকবে আমার মুখটি চেয়ে,
মাটিতে চাঁদ আসবে ধেয়ে, আসবে মালিক দেখব চেয়ে,
প্রেমে পাগল মত্ত মাদল বাজিয়ে আমি যাবই যাব,
ঠিকেই যদি ঠিক দিয়েছি, ঠিকানা সে খুঁজেই নেব,
দিল যদি হয় দিলদরিয়া, থাকেই যদি মহব্বত্‌
আমার সাথে খুদাও যে সাথ দেবেই দেবে আলবত্‌ ।

(গ) মেরা জো হাল হো সো হো বর্কে-নজর গিরায়ে জা ।
ম্যঁয় ইয়ুঁহী নালাকশ রহুঁ তু ইয়ুঁহী মুস্করায়ে জা ।।
লহজা-ব-লহজা, দম-ব-দম, জলওয়া-ব-জলওয়া আয়ে জা ।
তশ্‌না-এ-হুস্নে-জাত হুঁ, তশ্‌নালবী বড়ায়ে জা ।।
জিতনী ভী আজ পী সকুঁ, উজর্‌ ন কর, পিলায়ে জা ।
মস্ত্‌ নজর কা ওয়াস্তা, মস্তে-নজর বনায়ে জা ।।
লুৎফ্‌ সে হো কি কহর সে, হোগা কভী তো রু-ব-রু ।
উস্‌ কা জঁহা পতা চলে, শোর উয়োহী মচায়ে জা ।।
ইশ্‌ক কো মুতমইন ন রখ্‌, হুস্ন কে এতমাদ পর ।
উয়ো মুঝে আজমা চুকা, তু উসে আজমায়ে জা ।।
—হোকনা আমার বেহাল বেচাল,

না হয় শুধুই হাসতে থাকো,
বলতে থাকো বেহদ বাচাল,
তবু তসবিরের ঐ তসবী নিয়ে খেলতে থাকুক আমার এ দিল।
মাতাল আমি হবই হব তোমার ঐ রূপের নেশায়,
শরাব যখন ঢালছ তখন উপচে পড়ুক দিল পেয়ালায়,
প্রাণ ভরে পান করিয়ে চল, বানিয়ে দাও আজ দিওয়ানা,
প্রেমের মাতন্ দেখে নিলাম পরখ করতে তোমায় দিলাম,
গুনাহ না পুণ্য হল, যা হ'ল তা ভালই হ'ল,
তাজিয়া ছেড়ে কাজিয়া নিলাম, বাজিয়ে যাই তোমায় সালাম।
... ...

২। নিগহে ইয়াস অসর দেখুঁ ম্যাঁয়,
দামনে ইয়ার ভী তর দেখুঁ ম্যাঁয়।
নজ্য মেঁ চুঁঢ় রহী হ্যায় আঁখেঁ,
কাশ উন্হে এক নজর দেখুঁ ম্যাঁয়।

সরাপা আর্জু হুঁ, দর্দ হুঁ, দাগে তমন্না হুঁ।
মুঝে দুনিয়া সে ক্যোয়া মতলব কি ম্যাঁয় আপ অপনী দুনিয়া হুঁ।
কভী কয়েফে মুজস্সিম হুঁ, কভী শোকে সরাপা হুঁ,
খুদা জানে কি কিসকা দর্দ হুঁ কিসকী তমন্না হুঁ।
মুঝে জুঁবিশ মেঁ ক্যোয়া লায়েগী মৌজে সর্সরে আলম,
হরীমে কুদ্স কহতে হ্যায় জিসে ম্যাঁয় উসকা পর্দা হুঁ।
মুঝী মেঁ হুস্ন কা আলম মুঝী মেঁ ইশ্ক কী দুনিয়া,
নিহার অপনে পে হো জাউঁ অগর সৌ বার পয়দা হুঁ।

ক্যোয়া আ গয়া খয়াল দিলে বেকরার মেঁ,
খুদ আশিয়াঁ কো আগ লগা দী বহার মেঁ।
দশ্‌তে-জুনূনে-ইশ্‌ক কী গুলকারিয়াঁ ন পুছ,
ডুবা হুয়া হুঁ সর সে কদম তক বহার মেঁ।

ঔর ভী মেরে লিয়ে আফত কা সামাঁ হো গঈ,
হায় উয়োহ্ মখমুর আঁখে জব পশেমা হো গঈ।
ইশ্‌ক কো বেতাবিয়াঁ কব ছোড় সকতী হ্যায় মুঝে,
ফর্ক ইতনা হ্যায় কি অব আঁখোঁ সে পিনহাঁ হো গঈ।

—বেদনা ভার নামাতে গিয়ে হৃদয় হল ভারী,
কান্না তার থামাতে গিয়ে বেদন হল সারি,
নিরাশ মন সহাস হল, মরণ এলো দ্বারে,
শেষের বেশ দেখে তখন কপট সন্যাসী বললে চুপিসাড়ে,
একটিবার দেখব শুধু, দেখাও তুমি তারে।

আমার মাঝে বেদন বাজে,
সকল কাজে সকাল সাঁঝে,
কখন আমিই বেদন সুরা,
কখন আমিই পাগল পারা,
কোন কামনায় কোন নিরাশায়
আপনাকে মন আপনি মাতায়,
পণ নিয়েছি প্রণয় খেলায়,
প্রলয় দোল কি আমায় দোলায়!
বারে বারে ফিরে আসব হেলায়,

মাতায় যদি এই ধরণী
এমনি ধারা ভালবাসায় !

ঐ অশান্ত বসন্ত আজ হিয়ায় দিলে এ কি দোল,
আপনি আমি দিয়েছি আজ প্রণয় নীড়ে জেলে অনল,
আবার পাগল হয়ে ঢালছি শুধুই সে অনলে শীতল জল।

নেশায় বিভোর আজকে এ ভোর,
শরাবে নয় শরমে রাঙা হয়েছে আজ এ আঁখি মোর।
প্রেমের শরাব পিয়েছি প্রিয়,
বলতে হয় বলনা হেয়।
... ...

৩। দাগে-জিগর (জিগরের অনুভূতি)

(ক) জব উস রুখে পুরনূর কা জল্বঃ নজর আয়া,
কাবঃ নজর আয়া ন' কলীসা নজর আয়া।
ইয়েহ্ হুস্ন, ইয়েহ্ শোখী, ইয়ে করিশ্মঃ, ইয়ে অদায়ে,
দুনিয়া নজর আঈ মুঝে তু ক্যোয়া নজর আয়া।
জব দেখ্ ন সকতে থে তো দরিয়া ভী থা কত্রঃ,
জব আঁখ খুলী কত্রঃ ভী দরিয়া নজর আয়া।
হর রংগ তেরে রংগ মেঁ ডুবা হুয়া নিক্লা,
হর নক্শ্ তেরা, নক্শে কফেপা নজর আয়া।
হর জল্‌বে কো দেখা তেরে জল্‌বোঁ সে মুনব্বর,
হর বজম্ মেঁ তু অঞ্জুমন-আরা নজর আয়া।

—বিকশিত ঐ পূর্ণ চন্দ্র করল আমার চক্ষু উদ্ভাসিত, না মন্দির না মসজিদ না গির্জা, অকস্মাত হল অদৃশ্য। ঐ অপরূপ রূপ, ঐ চঞ্চলতা, ঐ পাগল করা হাবভাব যেন এক জাদুর প্রভাব বিস্তার করল আমার মধ্যে। এই জলের কণা দেখছি তো এই নদীর বিরাট প্রবাহ দেখছি। সারা পৃথিবী আমার হারিয়ে গেছে, সমস্ত জগত যেন তোমার রং-এ রাঙ্গিয়ে গেছে! স্থলে জলে অন্তরীক্ষে, আকাশের ঐ নীলিমাতেও যেন তোমারই চরণ চিহ্ন আঁকা! চতুর্দিকে এ কি রূপছবি, তোমারই জ্যোতির বিকাশ! এ যেন এক অপার অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ!

... ...

(খ) থম-থম কে উনকে কান মেঁ পহুঁচী সদায়ে দিল,
উড়-উড় কে রংগে চেহ্‌রঃ মেরা নামঃবর হুয়া।
ফর্‌য়াদ কৈসী, কিসকী শিকায়ত, কহাঁ কা হশ্র,
দুনিয়া উধর কো টুট পড়ী উয়োহ্ জিধর হুয়া।
বারগুগিয়ে শৌক কা অল্লাহ রে কমাল,
জো বেখবর হুয়া উয়োহ্ বড়া বাখবর হুয়া।

—আমার হৃদয়ের বাণী যেন ধীরে ধীরে প্রকাশিত হল। বড় ধীরে আমার মধ্যে চৈতন্যের বিকাশ ঘটল, তারপর আবার সব একাকার হয়ে গেল। কার নালিশ কিসের লজ্জা কে কি বলছে কোন হুঁসই রইল না। সারা পৃথিবী যেন ওনার পায়ের কাছে ভেঙ্গে পড়ল। হঠাৎ আমার চৈতন্য ফিরতে সব পর্দা খুলে গেল। আমার অনুভবে তাঁর সান্নিধ্য পেলাম, সমস্ত কিছুই তখন আমার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারলাম।

... ...

(গ) ধড়কনে লগা দিল্ নজর ঝুঁক গঈ,
কভী উনসে জব সামনা হো গয়া।
তেরী ইয়াদ কী উফ্ ইয়ে সরমস্তিয়াঁ,
কোঈ জৈসে পীকর শরাব আ গয়া।
মেরা উনকা বন্না বিগড়না হী ক্যেয়া,
নিগাহেঁ মিলী ঔর হিজাব আ গয়া।
অদায়োঁ মেঁ শোখী ঝলক্নে লগী,
কয়ামত কো লেকর শবাব আ গয়া।
—কি করে বোঝাই বলতো আমার মনের চঞ্চলতা! তোমার দিকে তাকাব কী, চোখ উঠছেই না। তোমাকে মনে করলেই আমার মধ্যে এমন একটা সর্বনাশা নেশা জেগে ওঠে কি বলি! কোন মদেই এ নেশা হয় না। এ যেন আমার মধ্যে থেকে আমাকে নিংড়ে বের করে নিয়ে কেউ নিরস্ত করে দিল, নজর মিলতেই লজ্জায় মরে গেলাম। আমার চেহারার ঐ বেপথু ভাব আমাকে ব্যস্ত করে দিল, যৌবনের ভরপুর উচ্ছ্বাস যেন মুহূর্তে আমার মধ্যে প্রলয় এনে দিল।

… … … … …

(ঘ) দিল পে মেরে গিরাঈ থী তুমনে হী বিজলিয়াঁ মগর,
আয়ো নজর কে সামনে মুঝকো হ্যায় এহতিমাল-সা।
হায় রে উয়োহ্ ইতাব মেঁ উনকী অদায়ে উনকী শক্ল্,
আঁখে ভী সুর্খ-সুর্খ-সী চেহরঃ ভী লাল-লাল-সা।
হুস্ন কী সেহ্রকারিয়াঁ ইশ্ক কে দিল সে পুঁছিয়ে,
বস্ল কভী হ্যায় হিজ্র-সা, হিজ্র কভী বিসাল-সা।
থাকে মজনুঁ সে ইয়ে আতী হ্যায় সদায়েঁ পৈহম্,
জিন্দগী হ্যায় গমে দিলবর মেঁ ফনা হো জানা।

নিগহে-শোক নে সব খোল দিয়ে বনদে নকাব,
সহ্‌র সমঝে থে উয়োহ্‌ পাবন্দে হয়া হো জানা।
—আমার হৃদয়ে তুমি করেছ বজ্রপাত, সমস্ত সত্ত্বা আমার কাঁপিয়ে দিয়েছ, তবু তুমি আমার নয়নের সমুখে এসে দাঁড়াও, তোমার ঐ রুদ্ররূপ, কষায় চোখ, প্রাণ ভরে দেখি। জানিনা কিসে হবে আমার এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি। নাকি তোমার ঐ আগুন-লাল রুদ্ররূপ, রাগ, রোষ, কঠিন কটাক্ষ আর বিদ্রূপ, এতেই খতম হবে আমার মাতম! প্রেমিকের চোখে নিজের রূপখানি যাচাই করেছ কি কখনো? কি জাদুই করেছ যে মিলন বিরহ সব একাকার করে দিয়ে আমার সমস্ত অনুভূতিকে নিরন্তর তুমিময় করে রেখেছ। মজনুর মত নিরন্তর প্রেমে মগ্ন হয়ে একেবারে লীন হয়ে গেলে তবেই কি মিলবে জীবনের স্বাদ? জীবনের পাত্র ভরে তুলতে হবে প্রিয়তমের বিরহের ব্যথায়, সেই মর্মন্তুদ বিরহ জ্বালাই কি জেবলে দেবে মনে প্রেমের আলো, ঘুচে যাবে দ্বিধা দ্বন্দ সংকোচ, তখনই কি আসবে পূর্ণ একাত্মতা!

ফিরাক গোরখপুরী

কবির আসল নাম রঘুপতি সহায়। জন্ম গোরখপুরে ১৮৯৬ সালে। ইনি কবি-নাম নেন 'ফিরাক' আর নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে গোরখপুরকেও সম্মানিত করেছেন তাই ফিরাক গোরখপুরী। 'ফিরাক' মানে বেজোড়। সত্যিই এ'র জুড়ি মেলা ভার। গুরু গোরক্ষনাথের কৃপায় এ'র জন্ম। যেমন ছিল এ'র বুদ্ধির ধার তেমনি মেধা। ছাত্র থাকা কালীন বরাবর বৃত্তি পেয়েছেন। এলাহাবাদে ছাত্র অবস্থাতেই প্রফেসর নাসরীর মত কবি আর সাহিত্যিকের সাহচর্য পান। এ'র পিতৃদেব গোরখপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত উকিল হওয়া সত্ত্বেও 'ইবরত' নামে কবিতাকৃতি করতেন। মুশায়েরাতেও এ'র যথেষ্ট রোয়াব ছিল। সুতরাং বলা যায় যে কবিতাকৃতি করা এ'দের বংশ পরম্পরাগত। তবে ফিরাক-এর নাম তাঁর পিতাকেও ছাড়িয়ে যায়।

ফিরাক এলাহাবাদের মেয়ো সেণ্ট্রাল কলেজ থেকে খুবই সফলতার সঙ্গে বি. এ. পাশ করেন। পরীক্ষায় ও'র এই উচ্চমানের ফলাফল দেখে সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকার ও'কে ডেপুটি কালেক্টরের পদে বহাল করেন। কিন্তু তার আগেই উনি কংগ্রেসের খাতায় নাম লিখিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রতী হয়েছেন। 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে জোর কদমে ছাত্র আন্দোলনে এগিয়ে চলেছেন। সুতরাং যা হবার তাই হল। শাসক হতে গিয়ে শাসিত হলেন। কারাবরণ করতে হ'ল। কিন্তু শাপে বর হ'ল। ঐ জেলখানাই তাঁকে কবি-খ্যাতির

চূড়ায় তুলে দিল। সেই সময়ে ওঁর সঙ্গে জেলে ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা হসরত মোহ্যনী, মৌলানা আবুল কলাম আজাদ! এঁদের সহযোগিতায় তাঁর কবিতার জলুস বেড়ে গেল। জেলের মধ্যে রীতিমত সাহিত্য সভা বসত। মুশায়েরা হত। তিনি যা লিখতেন সবার তাড়ায় সন্ধ্যাবেলা তাই মুশায়েরাতে তরন্নুমের সঙ্গে গেয়ে শোনাতেন। সে কি দারুণ উত্তেজনা আর উৎসাহ! ঐ সব বড় বড় সাহিত্যিকের সাহচর্যে ওঁর কবিতার বুনিয়াদ মজবুত হয়ে যায়। তাতে পালিশ পড়ে। তাই ওঁর প্রতিভার আরও স্ফুরণ হয়।

এই স্বদেশী আন্দোলন কিন্তু তাঁর রুটি কেড়ে নেয়নি। ১৯২৭ সালে জেল থেকে বেরিয়েই লখনৌ-এর কৃশ্চান কলেজে চাকরি পেয়ে যান। পরে অবশ্য সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কানপুরের সনাতন কলেজের উর্দুর প্রফেসর পদে যোগ দেন। নিজের যোগ্যতা আরও বাড়াতে পড়াশুনাও চালিয়ে যান। খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাশ করেন। তারপর আবার ফিরে যান এলাহাবাদে। ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর লেকচারার-এর পদ গ্রহণ করেন। সঙ্গে শেরোশায়রীর চর্চাও চলতে থাকে, নিয়মিত মুশায়েরাতেও যান। তখন তিনি অগুন্তি শের, গজল, রুবাইয়া এবং কতাএ রচনা করেন। তাঁর রচনার বিশেষত্ব ছিল যে তিনি আধুনিক সরল উর্দু শব্দের চাইতেও প্রাচীন কঠিন শব্দের ব্যবহার পছন্দ করতেন। তিনি বিচক্ষণ সমালোচকও ছিলেন।

একবার হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস কনফারেন্সে ওঁর ডাক পড়ে। ওঁকে আগে থাকতে ভাষণ লিখে তৈরী করে নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু উনি চার দিনে চার লাইনও লেখেন নি। কিন্তু যখন ওঁকে ভাষণ দিতে বলা হ'ল তখন উনি মাইক হাতে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওঁর কথার জাদুতে মানুষকে মুগ্ধ করে রাখেন, এমনিই ছিল ওঁর মেধা।

সেই সময় এলো উদ্দু বর্জনের হাওয়া। সবাই বলতে লাগল উদ্দু বিদেশী ভাষা, ফারসী থেকে এসেছে। যা লিখতে হবে বা বলতে হবে সবই হিন্দীতে রাষ্ট্রভাষায় হবে। কিন্তু উনি বললেন, হিন্দীতে সে রকম ভাষার গভীরতা কোথায়? একমাত্র তুলসী দাসের রামায়ণ ছাড়া আর কি আছে ঐ ভাষাতে? একদিন মুশায়েরাতে উনি শায়রী করছেন, অবশ্যই উদ্দুতে—

মৌত ইক গীত রাত গাতী থী,
জিন্দগী ঝুম ঝুম জাতী থী।
—এক রাতে মৃত্যু তার অনিত্যতার গান গাইছিল, আর জীবন ভরপুর আনন্দে তার পথ পরিক্রমা করছিল।

এমন সময় কেউ জোর আওয়াজে বলে উঠল, ফিরাক সাহেব আমরা উদ্দুতে শেরোশায়রী শুনতে আসিনি। পারেন তো শুদ্ধ হিন্দীতে কবিতা শোনান। রেগে উঠলেন ফিরাক। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি উদ্দুতেই শেরোশায়রী করব, যার ভাল না লাগে তিনি আসর ত্যাগ করতে পারেন। ব্যাস এরপর সভা নিস্তব্ধ। সবাই ফিরাক সাহেবের জীবন মৃত্যুর স্বরূপে মগ্ন হয়ে গেল।

ঐ সময় হিন্দী-প্রেমীরা শুধু ফিরাকেরই নিন্দা করেনি, মহামান্য গালিবকে বলত ফারসী থেকে বয়েৎ চুরি করেছেন আর মহামতি ইকবালকে বলত ইংরেজ কবিদের ভাব চুরি করেছেন।

ফিরাকের কবিতাকৃতি বেশীর ভাগই স্বাধীনতা মূলক। পরাধীনতা তাঁকে বড় দুঃখ দিত। তিনি যখন জেলখানায় ছিলেন তখন লিখেছিলেন—

অহলে-জিন্দা কো ইয়ে মজলিস হ্যায় সুবুতে ইসকা 'ফিরাক',
কি বিখর কর ভী ইয়ে শীরাজা পরেশাঁ ন হুয়া।

—জেলখানায় এসে যেন জিন্দা দিল বনে গেছে 'ফিরাক', তার
বই-এর বাঁধন আলগা হলেও, তাঁর জ্ঞানের পরিধি বেড়ে গেছে।

ফিরাক অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কারুর সঙ্গেই দিল খুলে মিশতে পারতেন না। এক সময় জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কিন্তু পরে উভয়ের মধ্যে মতের মিল না হওয়ায় সেই ঘনিষ্ঠতাই দূরত্বে পরিণত হয়। যে কারণে তিনি রাজনীতিতেও খুব সফলতা অর্জন করতে পারেন নি।

ফিরাককে 'ইশ্‌কীয়া'র কবি বা প্রেমের কবি বলে অভিহিত করা যায় না। এঁর কাব্যে, গজলে বেজে উঠেছে দেশাত্মবোধের অনুভব। প্রলয়ের নিগূঢ় ভাব, আধ্যাত্মিক অনুভূতি আবার হতাশা আর নিরা-শার নৈর্ব্যক্তিক ক্রন্দন যেন একাত্ম হয়ে মিশেছে তাঁর কাব্যে। ওঁর বই 'রূহে কায়নাত', 'শোলা-এ-সাজ', 'মশঅল', 'রূপ', শবনমিস্তান', 'রমজে কায়নাত'—এসব পড়লে অবহিত হতে হয় যে ওঁর এই প্রেম দেশপ্রেম, পরাধিনতার আর অপারগতার জ্বলন্ত প্রতিফলন।

জীবনের শেষদিকে ফিরাক খুবই আর্থিক অনটনে ভুগছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থও ছিলেন। শেষ পর্যন্ত জুলাই ১৯৮০ তে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সাহায্যের জন্য চিঠি লেখেন। ইন্দিরাজী তাঁকে মাসিক দু'হাজার টাকা মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দেন আর ইণ্ডিয়ান মেডিকেল ইন্সটিটিউটে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। সেখানেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ে। রাষ্ট্রিয় মর্যাদায় তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

শের

১। গরজ কি কট দিয়ে জিন্দগী কে দিন ইয়ে দোস্ত্।
উয়ো তেরী ইয়াদ মেঁ হোঁ ইয়া তুঝে ভুলানে মেঁ ॥
—জীবনের দিনগুলো যাহোক করে কাটিয়ে দিলাম,
তা তোমাকে মনে করতে না তোমায় ভুলতে গিয়ে, কে জানে।

... ...

২। মঞ্জিলে গর্দ কী মানিন্দ উড়ী জাতী হ্যয়।
উয়োহী অন্দাজে-জহানে-গুজরাঁ হ্যয় কি জো থা ॥
—এবারে তো ধুলোয় ভরে গেল পথ, আমার ভাগ্যচক্রে
হয়তো এইই ছিল, এই পথেই চলতে হবে।

... ...

৩। বফা-জফা মেঁ তেরী ইম্‌তিয়াজ সহল ন থা।
সমঝ-সমঝ কে মোহব্বত ভী আজ রোঈ হ্যয় ॥
—এখন প্রেমের অশ্রুও জায়গা বুঝে বয়,
এখন আর বিশ্বাস অবিশ্বাসে কোন ভেদ নেই।

... ...

৪। অভী ফিতরত্ সে হোনা হ্যয় নুমায়াঁ শানে-ইন্সানী।
অভী হর চীজ মেঁ মহসুস্ হোতী হ্যয় কমী অপনী ॥
—এখন মনুষ্যত্ব, মানবতা বোধ বা অনুশোচনা কিছুই
প্রকট নয়, শুধু নিজের অক্ষমতার বেদনা বয়ে চলা।

... ...

৫। ইয়ে জিন্দগী কে কড়ে কোস, ইয়াদ আতা হ্যয়।
তেরি নিগাহে-করম কা ঘনা-ঘনা সায়া ॥
—তোমার কৃপা-দৃষ্টিতে ধন্য আমি, সে কথাই ভাবব, নাকি
জীবনের কষাঘাতে জর্জরিত আমি, সে কথাই থাকবে চেতনায়।

৬। ইশ্‌ক দুনিয়া সে বেখবর হ্যয় মগর,
পেট কী বাত জান লেতা হ্যয়।
—প্রেমে পড়লে বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়,
কিন্তু ভেতরের কথা সব প্রকাশ হয়ে পড়ে।

... ...

৭। হম সে ক্যেয়া হো সকা মোহব্বত মে,
তূ নে তো খয়ের বেওয়াফাঈ কী।
—আমি আর ভালবাসতে পারলাম কই!
তুমি তো তবু বিশ্বাস ভাঙ্গতে পারলে!

... ...

৮। হয়াত হো কি অজল সবসে কাম লে গাফিল্,
কি মুখ্‌তসর ভী হ্যয় কারে-জহাঁ দরাজ ভী হ্যয়।
—জীবন বড় ছোট, মৃত্যুতেই শেষ। তুমি আর কোথায়
পালাবে! তার চাইতে তাড়াতাড়ি সব কাজ শেষ কর!

... ...

৯। হজারোঁ খিজ্র পৈদা কর চুকী হ্যয় নস্‌ল আদম কী,
ইয়ে সব তস্‌লীম, লেকিন আদমী অব তক্ ভটক্‌তা হ্যয়।
—যুগে যুগে কতই না পথ প্রদর্শক এলো গেল, কত সম্মান
নিয়ে গেল, কিন্তু আজও মানুষ তেমনি বেসাহারা।

... ...

১০। ফরেবে-অহদে-মোহব্বত কী সাদগী কী কসম্,
উয়ো ঝুঠ বোল কি সচ কো ভী প্যেয়ার আ জায়ে।
—ভালবাসা এমন ধোঁকায় ফেলে দেয় যে কি বলি,
তখন মিথ্যে প্রেমের অভিনয়ও সত্যি বলে মনে হয়।

... ...

১১। ইক তেরে ছুটনে কা গম, এক গম উনসে মিলনে কা,
জিনকী ইনায়তোঁ সে জী ঔর উদাস হো গয়া।
—এক তো তোমার বিরহের দুঃখ, দ্বিতীয় পুনর্মিলনের,
যার অনুকম্পা আমাকে উদাস করে দিয়েছে।

… … … … …

১২। রহা হ্যয় তু মেরে পহলু মেঁ ইক জমানে তক,
মেরে লিয়ে তো উয়োহী ইয়েন হিজ্র কে দিন থে।
—বেশ কিছুদিন তুমি আমার সঙ্গে ছিলে, কিন্তু
তখনই আমি তোমার জন্য বিরহাতুর ছিলাম।

… … … … …

১৩। তু ইয়াদ আয়ে তেরে জৌরো-জফা লেকিন ন ইয়াদ আয়ে,
তসব্বুর মেঁ ইয়ে মাসুমী বড়ী মুশ্কিল সে আতী হ্যয়।
—তোমাকে মনে পড়ে কিন্তু তোমার দুষ্টুমীগুলো
কল্পনায় বড় মুস্কিলে মনে আসে।

… … … … …

১৪। জো তেরে গেসু-এ-পুরখম সে খেল ভী ন সকে,
উন উঙ্গলিয়োঁ সে সিতারোঁ কো ছেড় সকতা হুঁ।
—আরে যে তোমার কোঁকড়া চুলের রাশ ছুঁতেও পেল না,
সেই আঙ্গুলে সেতারে কী মীড় তুলবে বল!

… … … … …

১৫। জিন্দগী হো কি আশিকী, দোনো
অপনী জিদ মেঁ পনাহ লেতী হ্যয়।
—জীবন আর প্রেম দুইই সমান জিদ্দীবাজ। দুয়েরই তো
আশ্রয়স্থল এই আয়ুষ্কাল।

… … … … …

১৬। গিরয়া-এ-হিজ্র পে ন জাইয়ে দোস্ত,
আঁখ করতী রহেগী কাম অপনা।
—বিরহের সন্তাপে সাড়া দিও না বন্ধু, তোমার নয়নই তোমার সঙ্গে ধৃষ্টতা করবে।

... ...

১৭। হুস্ন খুদ কুর্ব, ইশ্‌ক খুদ দুরী,
ওয়স্‌ল-ঈ-ফুর্কত তো ইক বহানা হ্যায়।
—রূপের একটা আকর্ষণ তো আছেই, কিন্তু প্রেম তো সব সময় দূরেই সরে থাকে। মিলন বিরহ তো একটা ছল মাত্র।

... ...

১৮। বনাকর হমকো মিট জাতে হ্যায় গম ভী শাদমানী ভী,
হয়াতে-চন্দ-রোজা হ্যায় হকীকত ভী কহানী ভী।
—আমাকে বিড়ম্বনায় ফেলে দিয়ে দুঃখ আর সুখ দু'জনেই সরে যায় ; মাত্র এই চারদিনের তো জীবন, তাতে কীইবা গড়ব আর ভাঙব !

... ...

১৯। মুঝে খবর নহীঁ ইয়ে হমদমো, সুনা ইয়ে হ্যায়,
কি দের-দের তক অব ম্যায় উদাস রহতা হুঁ।
—ভাইসব আমার তো কিছুই খেয়াল নেই, তোমরাই বলছ আমি নাকি আজকাল বড় উদাস থাকি।

... ...

২০। কোঈ সমঝে তো এক বাত কহুঁ,
ইশ্‌ক তৌফীক্ হ্যায় গুনাহ নহীঁ।
—তোমরা যদি শোন তো একটা কথা বলি,
প্রেম করা পাপ নয় বরং অনেক কিছু প্রাপ্য হয়।

নজ্‌ম্‌

অরে খেৱায়াবে-মুহব্বত কী ভী ক্যোয়া তা'বীর হোতী হ্যয়,
খুলে আঁখে তো দুনিয়া দর্দ কী তস্‌বীর হোতী হ্যয়,
উমীদেঁ টুট জায়ে ঔর ফির জীতা রহে কোঈ,
ন পুছ এ দোস্ত! ক্যোয়া ফুটী হুয়ী তকদীর হোতী হ্যয়,
সরাপা দর্দ হো কর জো রহা জীতা জমানে মেঁ,
উসী কী খাক ইয়ারো গৈরতে-অক্‌সীর হোতী হ্যয়।

—আরে স্বপ্নে দেখা প্রেমের খেলার ছল চাতুরীরও কি কামাল তা কি জানো বন্ধু! যেই স্বপ্ন ভাঙ্গল, চোখ খুলল, অমনি সবই যেন শূন্য আর বেদনাময় মনে হল। আশার অপমৃত্যু কি সত্যিকারের মৃত্যুর চাইতে কিছু কম পীড়াদায়ক! সমস্ত শরীর মনে যে বেদনা রয়ে গেল সেই নিরাশার মধ্যে বেঁচে থাকা যে কি দুষ্কর সেই অবস্থা যার হয়েছে সে-ই অনুভব করবে।

রুবাই

১। ইয়ে জিন্দগী-এ-গম তেরী বহুত দেখী,
তেরী নৈরঙ্গী-এ-তবীয়ত দেখী,
খিলতে নহী তেরে ভেদ, ময়নে তুঝ মে,
হঁস দেনে কী রোতে-রোতে আদত দেখী।
—ওহে জীবন-যন্ত্রনা, আমি তোমার বিবশতা দেখেছি,
তোমার আনন্দ বেদনার দোলায় দুলেছি,
তোমার কান্নার মধ্যে হাসির ফুলঝুরি দেখেছি,
তাইতো আমি তোমার আসল রূপ ধরতেই পারি না।

... ...

২। হ্যয় রূপ মেঁ উয়ো খটক, উয়ো রস, উয়ো ঝংকার,
কলিয়োঁ কে চটকতে ওয়ক্ত জৈসে গুলজার,
ইয়া নূর কী উঙ্গলিয়োঁ সে দেবী কা শৃঙ্গার,
জৈসে শবে-মাহ মেঁ বজাতী হো সিতার।
—আহা রূপেরই বা কি মোহ আর মাধুর্য কি বলব!
কলি থেকে যখন গোলাপ ফোটে,
তাতে পড়ে চাঁদনীর উদ্ভাস,
যেন সেতারের মীড় ছেয়ে যায় পূর্ণিমার রাতে!

১। ডরতা হূঁ কামিয়াবী-এ-তক্‌দীর দেখকর।
ইয়ানী সিতমজরীফী-এ-তক্‌দীর দেখকর॥
কালিব মেঁ রূহ্ ফূঁক দী ইয়া জহর ভর দিয়া।
ম্যয় মর গয়া হয়াত কী তাসীর দেখকর॥
হৈরাঁ হুয়ে ন থে জো তসব্বুর মেঁ ভী কভী।
তসবীর হো গয়ে তেরী তসবীর দেখকর॥
খোয়াবে-অদম্ সে জাতে হী জী পে বন্ গয়ী।
জহরাবা-এ-হয়াত কী তাসীর দেখকর॥
ইয়ে ভী হুয়া হ্যয় অপনে তসব্বুর মেঁ হোকে মহব।
ম্যয় রহ্ গয়া হূঁ আপ কী তস্‌বীর দেখকর॥
সব মরহলে হয়াত কে তয় করকে অব 'ফিরাক'।
বৈঠা হুয়া হূ মৌত মেঁ তাখীর দেখকর॥

—নিজের ভাগ্যের পরিহাস দেখে নিজেরই আম্যর হাসি পায়। যদি ভাল কিছু ঘটে, ভয় পাই, না জানি পরের চোটটা কোন দিক দিয়ে বা আসে! জীবন আমায় জীবন্তেই কবর দিয়েছে। আমার আত্মাকে বেপাত্তা করে সেখানে ভরে দিয়েছে বিষ। কল্পনাতেও কখনো নিজেকে আমি দুর্বল ভাবিনি, সেই আমাকেই কি না জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার হতে হল! এখন আমি মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে আছি, কল্পনায় নিমগ্ন হয়ে আমি শুধু তোমারই অকল্পনীয় রূপছবি প্রত্যক্ষ করছি। আমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ভাঁজ করে তুলে রেখে আমি 'ফিরাক' তোমারই আসার আশায় দিন গুনছি।

... ...

২। উমীদে-মর্গ কব তক, জিন্দগী কা দর্দে-সর কব তক ?
ইয়ে মানা সব্‌র্ করতে হ্যয় মোহব্বত মেঁ, মগর কব তক ?
দিয়ারে-দোস্ত হদ হোতী হ্যয় ইয়ুঁ ভী দিল বহলনে কী !
ন ইয়াদ আয়েঁ গরীবো কো তেরে দীয়ারো-দর কব তক ?
ইয়ে তদ্‌বীরেঁ ভী তক্‌দীরে মোহব্বত বন নহীঁ সকতী।
কিসী কো হিজ্র মেঁ ভুলে রহেঙ্গে হম মগর কব তক ?
ইনায়ত কী, করম কী, লুত্‌ফ্‌ কী আখির কোঈ হদ্‌ হ্যয়।
কোঈ করতা রহেগা চারা-এ-জখ্‌মে-জিগর কব তক ?
কিসী কা হুস্ন রুসওয়া হো গয়া পর্দে হী পর্দে মেঁ।
ন লায়ে রংগ আখিরকার তাসীরে নজর কব তক ?

—আর কতদিন তোমার প্রতিক্ষায় কাল গুনব। হে কালান্তক, জীবন নিয়ে এই চিন্তা ভাবনা মাথা ব্যথা আর কতদিন। এই প্রিয় জীবনের মায়ায় আর কতদিন এই বন্ধন সইতে হবে! কবে কোন প্রবাসে কোন প্রিয় বন্ধুর আবাসে দুদিনের হাসি খেলায় কাটিয়েছি সেই স্মৃতির ঝাপসা দিনগুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে ভাবতেই বা আর কতকাল কাটাব। ভাগ্যকে মেনে নিয়ে তার সঙ্গে আপস করব, কারুর দয়ার প্রত্যাশায় দিন গুনব, তাই বা কতকাল ! করুণা, কর্ম বা সৌন্দর্য তারও একটা সীমারেখা আছে। কে আছে যে আমার এই রক্তাক্ত হৃদয়ের চিকিৎসা করবে। যদি কোন সুন্দর কিছু থেকে থাকে তাও আমার চোখের আড়ালে পর্দার পেছনে সরে গেছে। আমার এই নিরাশা ভরা দিনগুলোতে আমি কোথা থেকে রঙিন আলো পাব !

... ...

৩। শামে-গম কুছ উস্ নিগাহে-নাজ কী বাতেঁ করো।
বেখুদী বড়তী চলী হ্যায় রাজ কী বাতেঁ করো ॥
নকহতে-জুল্ফে-পরেশাঁ, দাস্তানে-শামে-গম।
সুবহ হোনে তক্ ইসী অন্দাজ কী বাতেঁ করো ॥
ইয়ে সুকুতে-ইয়াস্ ইয়ে দিল কী রগোঁ কা টুটনা।
খামশী মেঁ কুছ শিকস্তে-সাজ কী বাতে করো ॥
হর রগে-দিল্ বজ্দ্ মেঁ আতী রহে, দুখতী রহে।
ইঁয়ূহী উসকে জা-য়ো-বেজা নাজ কী বাতে করো ॥
কুছ কফ্স কী তীলিয়োঁ সে ছন রহা হ্যায় নূর সা।
কুছ ফজা, কুছ হসরতে-পরবাজ কী বাতেঁ করো ॥
জিসকী ফুরকত নে পলটদী ইশ্ক কী কায়া 'ফিরাক'।
আজ উসী ঈসা-নফ্স দমসাজ কী বাতেঁ করো ॥

—এখন তো শুধুই রাত্রির অন্ধকার তবু একটু আশার আলো দেখাও। নৈরাশ্য তো বেড়েই চলেছে, কিছু তো আশার বাণী শোনাও। এই নিঃসিম নীরবতা যে আর সহ্য হয় না। সুগন্ধ আছে, আছে আকাশ, আছে প্রকাশ—আমার সকাল না হওয়া পর্যন্ত এইসব ভালো ভালো কথা বল। আমার ভেতরটা যে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, মনটা যে দেহ পিঞ্জরে মাথা কুটছে, পাচ্ছ নাকি দেখতে! আমি যে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি, আমার শিরা উপশিরা যে ক্রমশঃ কঠিন হয়ে তাদের স্পর্শ কাতরতা হারিয়ে ফেলছে। প্রিয় বন্ধু, তুমি তোমার পবিত্র হৃদয়ের পরশ দিয়ে আমায় বিচ্ছেদ নয় মিলনের স্বাদ এনে দাও, মৃত্যু নয় জীবনের কথা বল! ত্রান কর আমায় মুক্তি দাও।

... ...

৪। ইয়ে মানা জিন্দগী হ্যায় চার দিন কী।
বহুত হোতে হ্যায় ইয়ারো চার দিন ভী ॥
খুদা কো পা গয়া বাইজ, মগর হ্যায়।
জরুরত আদমী কো আদমী কী ॥
বসা-ঔকাত্ দিল সে কহ গয়ী হ্যায়।
বহুত কুছ উয়ো নিগাহে-মুখ্তসর ভী ॥
মিলা হুঁ মুস্করাকর উসসে হর বার।
মগর আঁখোঁ মেঁ ভী থী কুছ নমী সী ॥
মোহব্বত মেঁ করেঁ ক্যেয়া হাল দিল কা।
খুশী হী কাম আতী হ্যায় ন গম হী ॥
ভরী মহফিল মেঁ হর ইক সে বচাকর।
তেরী আঁখোঁ নে মুঝ সে বাত কর লী ॥
লড়কপন কী অদা হ্যায় জান-লেওয়া।
গজব ইয়ে ছোকরী হ্যায় হাথ ভর কী ॥
হ্যায় কিতনী শোখ তন্জ্ অয়্যামে-গুল পর।
চমন মেঁ মুস্করাহট হর কলী কী ॥
রকীবে-গমজদা অব সবর্ কর লে।
কভী উস্সে মেরী ভী দোস্তী থী ॥

—মানছি জীবন মাত্র দু'চার দিনের কিন্তু দু'চার দিনও কিছু কম নয়। তেমন করে ডাকতে পারলে খুদাও মিলে যায়। জীবনে মানুষের প্রয়োজন মানুষের, কিন্তু তার খোঁজ পেলাম কই! বলবে সবুর কর, আশা পূর্ণ হবে। শুনেছি একবার নজর মিললেই নাকি মহব্বত পয়দা হয় আর তার নাকি এমনই প্রভাব যে ভাল মন্দ জ্ঞানগম্যি সব হারিয়ে যায়। ভরা মহ্ফিলেও চোখে চোখে কথা বলা যায়। বসন্ত ঋতু এলে

বাগবাগিচায় ফুলকলিদের হাসিও দেখা যায়। জানিনা কবে আমার সেই অবুঝ যৌবন হারিয়ে গেছে! কোনো একদিন আমারও যে অমন স্বপ্নিল দিন ছিল ভেবে হাসি পায়। মনে হয় বসন্ত ঋতুই যেন উল্টে আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করছে! ওহে আমার দুঃখিত প্রতিদ্বন্দ্বী, মনে করো কোন একদিন তোমার সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব ছিল।

... ...

সুকুতে-শাম মিটায়ো, বহুত্ অঁন্ধেরা হ্যয়
সুখন কী শময় জলায়ো, বহুত অঁন্ধেরা হ্যয়
চমক উঠেগী সিয়াহ্-বখ্তিয়াঁ জমানে কী
নবা-এ-দর্দ সুনায়ো, বহুত অঁন্ধেরা হ্যয়
দিয়ারে-গম্ মেঁ দিলে-বেকরার ছুট গয়া
সম্ভল কে ঢুঁড়নে জায়ো বহুত্ অঁন্ধেরা হ্যয়
ইয়ে রাত উয়ো হ্যয় কি সুঝে জহাঁ ন হাথ কো হাথ
খয়ালো দূর ন জায়ো, বহুত অন্ধেরা হ্যয়
উয়ো খুদ নহীঁ জো সরে-বজ্মে-গম তো আজ উসকে
তবস্সুমো কো বুলায়ো বহুত্ অঁন্ধেরা হ্যয়
পসে-গুনাহ জো ঠহরে থে চশ্মে-আদম মেঁ
উন আঁসুয়ো কো বহায়ো, বহুত অঁন্ধেরা হ্যয়
ইয়ে গম কী রাত তো কটতী নজর নহীঁ আতী
ইক ঔর রাত বনায়ো, বহুত অঁন্ধেরা হ্যয়
গুজস্তা অহদ কী ইয়াদোঁ কো ফির করো তাজা
বুঝে চিরাগ জলায়ো, বহুত অঁন্ধেরা হ্যয়
থী এক উচটতী হুয়ী নীদ্ জিন্দগী উস কী
'ফিরাক' কো ন জগায়ো বহুত অঁন্ধেরা হ্যয়

—সন্ধ্যা না নামতেই চতুর্দিকে দারুণ অন্ধকার। এই অসহ্য অন্ধকার সরাও। দোহাই তোমার দুটো কথা বল। ভেতরে বাইরে অতলান্ত অন্ধকার আর স্তব্ধতা। ওঃ ভেঙ্গে দাও এই অটুট নীরবতা, না হয় বুকফাটা দুঃখের গানই শোনাও। দেখাও না এক চিলতে হাসি। ওঃ এখানে যে বড় অন্ধকার! এই দুঃখের নগরীতে বড় ধীরে পা ফেলবে, দেখছ না এখানে কি অন্ধকার! এই অন্ধকার রাতে এক হাত অন্য হাতকে খুঁজে পায় না। আমার আত্মার উদ্ভাস, আমার অনুভূতি! তোমরা যেন আমায় একা ফেলে চলে যেও না। দেখছ না এখানে কি নিদারুণ অন্ধকার! তোমাদের যদি হারিয়ে ফেলি তবে আমি কী নিয়ে বাঁচব! এখনো দেখছি মানুষের চোখে অশ্রু বয়; এখনো অনুভূতির মৃত্যু হয়নি। এখনো মনে পশ্চাত্তাপের দুঃখ জাগে। ওঃ এ যে নিদারুণ অন্ধকার। এই রাত কি আর কাটবে না! আমি এখন অতীতের আলোয় ভরা আকাশ মনের ভেতরে দেখছি। কিন্তু এখানে ওঃ বড় অন্ধকার। আমার অতীতের স্মৃতিরা সব নতুন করে জেগে উঠে নিবন্ত প্রদীপকে আবার জ্বালাও। এখানে যে বড় অন্ধকার। এই অন্ধকার কারার জীবন ফিরাকের এক অভিশপ্ত ঘুম। এই অন্ধকারে দয়া করে তাকে জাগিও না।

সাহির লুধিয়ানবী

লুধিয়ানার এক জায়গীরদার ঘরানায় ১৯২২-এর ৮ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন এই শায়র। এঁর আসল নাম ছিল আবদল হুই।

বড়লোকের একমাত্র সন্তান তাই ছোট থেকে খুবই আদরে আর সচ্ছলতায় দিন কেটেছে তাঁর। কাপ্তেনীও ছিল যথেষ্ঠ। হালকা চেহারা সোজা ওল্টানো চুল আর ঝকঝকে হাসি। বড় বড় পা ফেলে বেপরওয়া হয়ে হাঁটতেন, দেখলে মনে হত বেশ বড় কবি। লাহোর কলেজে পড়তেন আর শেরোশায়রী করতেন। বড় আশা যে একজন নামী দামী শায়র হবেন। বন্ধুবান্ধবদের চা সিগারেট খাওয়াতেন আর উদাত্ত স্বরে নিজের শের বা গজল শোনাতেন।
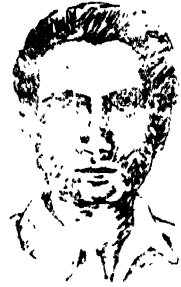
কিন্তু অত চা সিগারেট খাইয়েও কোন লাভ হয় নি। কেউ তাঁকে বা তাঁর গজলকে কোন দাম দেয় নি। তাঁর প্রথম কবিতার বই "তলখিয়া" কোন প্রকাশক ছাপতে রাজী হয় নি। বন্ধুরা সামনে তোষামোদ করত আর আড়ালে হাসাহাসি করত। বড় ব্যথা পেলেন আবদল। এমন কি যাকে তিনি তাঁর প্রেয়সী মনে করতেন একদিন সেই মেয়েটিও তাঁর লেখা নিয়ে তাঁকে ব্যঙ্গ করে। তখন বড় দুঃখে তিনি লাহোর ছেড়ে ফিরে এলেন লুধিয়ানায় মায়ের কাছে।

বাড়ীতে ফিরে দেখলেন মা কত অসহায়, মা'র কত অসম্মান হচ্ছে সেখানে। মাকে ছাড়াও তাঁর বাবা আরও কয়েকটি বিয়ে করেছেন। সেই সব সপত্নিদের অত্যাচারে মা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের দাবি করে মা ছেলেকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে

আসেন। ছেলেও মায়ের অপমানে অপমানিত হয়ে বাপের সংস্পর্শ ত্যাগ করলেন। বাপও ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। সম্পত্তিও গেল। শুরু হ'ল দারুণ দুঃখের দিন, জীবনের কঠিন মোড়। ওদিকে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে কলেজ থেকে রাষ্টিকেট হতে হ'ল। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল যে একটা সিগারেট কেনার পয়সাও জোটে না। এক সময় কত সিগারেট খাইয়েছেন সবাইকে, এখন নিজে একটা সিগারেট ভেঙ্গে দু'খানা করে খান। এবার লুধিয়ানা ছেড়ে আবার লাহোর চলে গেলেন।

লাহোরে পেঁছে কবি প্রকাশনার কাজ নিলেন। দু'খানা কাগজের প্রকাশনা একলাই চালাতে লাগলেন। তাতেও যখন দিন গুজরান হওয়া ভার হ'ল তখন মাকে রেখে তাঁর স্বপ্নের জগত বোম্বাইতে পাড়ি দিলেন কিছু শেরোশায়রী সম্বল করে। সেখানে গিয়ে একটু আশার আলো দেখতে পেয়েই মা'কে আনতে লাহোর ছুটলেন। কিন্তু ততদিনে দেশ বিভাগের আগুন জ্বলে উঠেছে চারিদিকে, লাহোরও জ্বলছে তখন। তার মধ্যে মা যে কোথায় হারিয়ে গেলেন তার কোন হদিসই পেলেন না তিনি। এদিকে 'সবেরা' কাগজে তিনি যে নিবন্ধ লিখে-ছিলেন তাতে পাকিস্তান সরকার দেশদ্রোহিতার গন্ধ পাওয়ায় অ্যারেষ্ট হয়ে গেলেন তিনি। মনের দুঃখে আর জ্বালায় কবিতার অপমৃত্যু ঘটতে লাগল আর নিজে অসহায়তার শিকার হয়ে জেলের মধ্যে বন্ধ হয়ে মুক্তির দিন গুনতে লাগলেন।

বন্দীত্ব ঘুচতেই জেল থেকে বেরিয়ে সেই আগুনের নদী পেরিয়ে তিনি সোজা চলে এলেন দিল্লী। এখানে এসে খুঁজতে খুঁজতে এক সরকারি ক্যাম্পে মা'কে পেয়ে গেলেন। চোখের জলের মধ্য দিয়ে আবার মা ও ছেলের মিলন হ'ল। আর ছাড়াছাড়ি নয়, মাকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বম্বে রওনা হলেন তিনি।

মির্জা গালিব-এর মত তিনিও তাঁর এক বন্ধুর পরামর্শে নিজের নাম বদল করে আবদল হুই থেকে হয়ে গেলেন শায়র সাহির লুধিয়ানবী। 'সাহির' মানে 'জাদুকর'। সত্যিই তিনি ছিলেন কথা ও সুরের জাদুকর। এর পরে তাঁর চলার পথে আর কোন বাধা আসে নি। শায়রের গাড়ী বিনা বাধায় চলেছে। পার হয়ে চলেছেন একের পর এক উন্নতির সোপান। বোম্বাই ফিল্মী জগতের রূপোলী পর্দায় নায়ক নায়িকার গলায় তাঁর গান দিনের পর দিন সুরের তুফান তুলেছে! একদিন বন্ধুদের অশ্রদ্ধার শায়রীর বই সেই 'তলখিয়া'র দশ সংস্করণ ইতিমধ্যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আরও কত বই প্রকাশিত হয়েছে, পুরস্কৃত হয়েছে।

সাহির সাব্-এর মাতৃভাষা ছিল গুরুমুখী। জন্মকর্মও ঐ দেশে। জন্ম তো লুধিয়ানায়, কর্মও লাহোর আর রাওলপিণ্ডিতে। কিন্তু একটা জিনিস অনুধাবন করার মত যে তাঁর লেখায় কোথাও ঐ গুরুমুখীর গুরুগম্ভীরতা বা বায়গুরু বা ওয়েহোয়ের কোন রকম নাম নিশা নেই। সরল হিন্দী নয়তো মিঠাস ভরা উর্দুতেই তাঁর শের, রুবাই, নজ্‌ম্‌ গজল আর গীতগুলি লেখা। তাঁর রচনায় শের কম, গীতই বেশী।

তাঁর স্নেহময়ী মা'কে তিনি বড় ভক্তি করতেন। তাঁর চোখে নারী জাতির আদর্শ স্বরূপ ছিলেন তাঁর মা। নারী জাতির অবমাননা তিনি সইতে পারতেন না। তাই তাঁর 'চক্‌লে', 'ঔরত নে মর্দ কো জনম দিয়া' এই সব গজল-এ পুরুষদের কুকীর্তিকেই তুলে ধরেছেন। গভীর দেশাত্মবোধও ছিল তাঁর আর ছিল স্বাভিমান। তাঁর কবিতার মর্মস্পর্শী গভীরতায় আমরা পাই জীবনানন্দের কবিতার ছোঁয়া। তাঁর মতা-এ-গয়ের' কবিতায় যেন কোন সুদূরে হারিয়ে এক মনোলীনা প্রিয়ার দৈহিক উপস্থিতির উষ্ণতার অনুভব এনে দেয়।

মায়ের যত্নে আদরে কবিতার পর কবিতা লিখে চলেন সাহির। স্বপ্ন সার্থক হয়েছে তাঁর। প্রশংসার তুঙ্গে উঠে অন্য এক স্বপ্নের জগতে পাড়ি জমালেন ১৯৮০ তে।

অত বড় হৃদয়ও হৃদরোগ সইতে পারল না। চলে গেলেন খোদ খুদার দরবারে তাঁর দিল্ বহ্‌লাতে। সেখানে গিয়েও হয়তো তরন্নুমের সঙ্গে গাইছেন—

জীবন কে সফর মেঁ রাহী,
মিলতে হ্যাঁয় বিছড় জানে কো'
ঔর দে জাতে হ্যাঁয় ইয়াদেঁ,
তন্‌হাঈ মেঁ তড়পানে কো।
—জীবনের পরিক্রমায় পথিক,
মিলনের নামে আসে বিচ্ছেদ,
থাকে শুধু স্মৃতি, আর নিঃসঙ্গতার বেদনা।

শের

১। জিন্দগী কো বেনিয়াজে আর্জু করনা পড়া,
আহ্ কিন আখোঁ সে অঞ্জামে-তমন্না দেখতে !
—জীবনের কাছে প্রার্থনা করতে হ'ল, আমায় আকাঙ্খা রহিত কর, না হ'লে কেমন করে আমি এই বিরহের সন্তাপ সইব !

... ...

২। তুম মেরে লিয়ে অব কোঈ ইলজাম ন ঢুঁড়ো,
চাহা থা তুম্হে, ইক ইয়েহী ইলজাম বহুত হ্যয় ।
—আর তুমি আমাকে কোন দোষে দোষী কোরো না, আমার একমাত্র অপরাধ, তোমাকে একান্ত করে পেতে চেয়েছিলাম ।

.. ..

৩। তু হিন্দু বনেগা, ন মুসলমান বনেগা,
ইনসান কী ঔলাদ হ্যয়, ইনসান বনেগা ।
—তোরা না হিন্দু না মুসলমান,
তোরা সব মানব শিশু, তোরা সব মানুষ হবি ।

... ...

৪। অপনী তবাহিয়োঁ কা মুঝে কোঈ গম নহীঁ,
তুমনে কিসী কে সাথ মোহব্বত নিবাহ তো দী ।
—আমি বর্বাদ হয়ে গেলাম তাতে কোন দুঃখ নেই,
তুমি তো আর কাউকে ভালবেসে সার্থক হতে পেরেছ !

... ...

৫। মুঝে মালুম হ্যয় অঞ্জাম রুদাদে-মোহব্বত কা,
মগর কুছ ঔর থোড়ী দের সয়ঈ-এ-রায়গাঁ কর লুঁ ।
—আমি খুব ভাল করে জানি, প্রেমের অন্ত কী, কিন্তু তবুও কেন বা লোভ হয় যে আরও একটু ব্যর্থ প্রয়াস করি ।

৬। নিগাহেঁ ঝুকতে-ঝুকতে ভী বহম টকরা হী জাতী হ্যয়,
মোহব্বত ছুপতে-ছুপতে ভী নুমায়াঁ হোতী জাতী হ্যয়।
—যতই চোখের পলক সরাও তবুও পরস্পরের প্রেমে পড়েই যেতে হয়। লুকিয়ে প্রেম করলেও শেষে ধরা পড়তেই হয়।

... ...

৭। ইতনে করীব আ কে ভী ক্যোয়া জানে কিস লিয়ে,
কুছ অজনবী সে আপ হ্যয় কুছ অজনবী সে হম।
—এত কাছে এসেও তুমি যেন তেমনিই অপরিচিত, আমিও হয়তো তাই।

... ...

৮। মৌত কভী ভী মিল সকতী হ্যয়, লেকিন জীবন কল ন মিলেগা,
মরনেওয়ালে! সৌচ-সমঝ লে, ফির তুঝকো ইয়ে পল ন মিলেগা।
—মৃত্যু তো যখন হোক ঘটতেই পারে কিন্তু জীবন! যারা মৃত্যু কামনা করছ তারা বুঝে সুঝে কোরো, চাইলেও এই জীবন কিন্তু আর ফিরে পাবে না।

... ...

৯। কৌন-সা এইসা দিল হ্যয় জগী মেঁ জিসকো গম কা রোগ নহীঁ,
কৌন-সা এইসা ঘর হ্যয় জিসমেঁ সুখ হী সুখ হ্যয় সোগ নহীঁ!
—কোন হৃদয়ে বল শুধু সুখই সুখ, দুঃখ নেই! কোথায় এমন ঘর আছে বল যেখানে শুধুই আনন্দ, শোক-দুঃখ নেই!

.. ..

১০। হয়াত ইক মুস্তকিল গম কে সিওয়া কুছ ভী নহীঁ শায়দ,
খুশী ভী ইয়াদ আতী হ্যয়, তো আঁসু বন কে আতী হ্যয়।
—এই জীবন এক স্থায়ী দুঃখ ছাড়া অন্য কিছুই নয়, আনন্দের স্মৃতি যখন মনে পড়ে তখনও তো কান্নাই পেয়ে যায়।

১১। ইস জীবন মে' কিতনে হী দুখ হো লেকিন সুখ কী আস তো হ্যায়,
দিল মে' কোঈ অর্মা বসা হ্যায়, তো আঁখ মে কোঈ পিয়াস তো হ্যায়।
—এই জীবনে দুঃখ যতই থাক কিন্তু সুখের আশাও তো আছে, হৃদয়ে রয়েছে কত না আনন্দের রেশ, চোখ ভরে আছে দৃষ্টিসুখের নন্দনে।

... ...

১২। জীবন নে ইয়ে ফল দিয়া হ্যায়, মৌত সে ইয়ে ফল ন মিলেগা,
মরনেওয়ালে! সোচ-সমঝ লে, ফির তুঝকো ইয়ে পল ন মিলেগা।
—জীবন আছে তাই আছে তার ফল প্রাপ্তি,
কিন্তু একবার মরে গেলে তো সব সমাপ্তি।

নজ্ম্

রদ্দে অমল (প্রতিক্রিয়া)

চন্দ কলিয়াঁ নিশাত কী চুনকর্
মুদ্দতো' মহ্‌বে-ইয়াস রহতা হু',
তেরা মিলনা খুশী কী বাত সহী,
তুঝ সে মিলকর উদাস রহতা হু'।
—তোমার খুশীর জন্য একরাশ সুখের মুহূর্ত চয়ন করলাম, কিন্তু তবুও তো মনটা আমার বিরহেই ডুবে রয়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা হবে সে তো কত আনন্দের, কিন্তু তবুও মনটা উদাস হয়ে রয়েছে।

রুবাই

১। ইনসান রহ্মত্ সে মখ্মুর,
উয়োহ্ হ্যায় তকদীর সে মজবুর।
পেসানী মেঁ জো লিখা হ্যায়,
উয়োহ্ পেশ আয়েগী জরুর।
—মানুষ দেবতার অন্ধ ভক্ত.
কিন্তু সে ভাগ্যের অধীন।
তিনি কপালে যা লিখেছেন.
তা তো অবশ্যই ফলবে।

... ...

২। ইয়ে মহলোঁ, ইয়ে তখ্তো, ইয়ে তাজোঁ কী দুনিয়া.
ইয়ে ইন্সা কে দুশমন সমাজোঁ কী দুনিয়া.
ইয়ে দৌলত কে ভুখে, রিয়াজোঁ কী দুনিয়া,
ইয়ে দুনিয়া অগর ন মিল ভী যায় তো কোয়া হ্যায়!
—এই প্রাসাদ এই সিংহাসন আর মুকুটের দম্ভভরা এক অসার দুনিয়া, যে শুধু চেনে ঐশ্বর্য ও টাকা আর ঘোরায় সমাজের চাকা, এমনি দুনিয়া না পেলে তাতে কীইবা আসে যায়!

... .

৩। উয়োহ্ সুবহ্ কভী তো আয়েগী.
ইন কালি সদিয়োঁ কে সর সে জব রাত কো আঁচল ঢলকেগা,
জব দুখকে বাদল পিঘলেংগে, জব সুখ কা সাগর ছলকেগা,
জব অম্বর ঝুমকে নাচেগা, জব ধরতি নজমে গায়েগী,
উয়োহ্ সুবহ্ কভী তো আয়েগী।
—একদিন তো সেই মধুর প্রভাত আসবেই, যখন রাত তার আঁধার আঁচল নিয়ে সরে যাবে, যখন দুঃখের বাদল ঝরে গিয়ে

সুখের সাগর ছলকাবে, যখন আকাশ মেঘের ডম্বরু বাজিয়ে নৃত্য করবে, যখন ধরা বসন্তের গান গাইবে. এমনি মধুর প্রভাত কখনো না কখনো তো আসবেই।

গজল

১। তাজমহল

তাজ তেরে লিয়ে ইক্ মজ্হরে-উল্ফত্ হী সহী
তুম্কো ইস্ বাদিয়ে-রংগী সে অকীদত্ হী সহী
মেরী মহবূব ! কঁহী ঔর মিলা কর মুঝ্সে

... ...

বজ্মে-শাহী মেঁ গরীবোঁ কী গুজর ক্যোয়া মানী ?
সব্ত্ জিস্ রাহ পে হোঁ সত্বতে-শাহী কে নিশাঁ
উস পে উল্ফত্ ভরী রূহোঁ কা সফর ক্যোয়া মানী

... ...

মেরী মহবুব পসে-পর্দা এ তশহীরে-বফা
তুনে সত্বত্ কে নিশানোঁ কো তো দেখা হোতা
মর্দো শাহোঁ কে মকাবির সে বহল্নে বালী !
অপনে তারীক্ মকানো কো তো দেখা হোতা

অন্গিনত্ লোগোঁ নে দুনিয়া মেঁ মোহব্বত কী হ্যয়
কৌন কহ্তা হ্যয় কি সাদিক ন থে জজ্বে উনকে ?
লেকিন উনকে লিয়ে তশ্হীর কা সামান নহীঁ
ক্যোঁউকি উয়ো লোগ ভী অপনী হী তরহ মুফ্লিস্ থে

ইয়ে ইমারাতো-মকাবির. ইয়ে ফসীলেঁ, ইয়ে হিসার
ম্তাক্-উল্হ্কম্ শাহনশাহোঁ কী অজমত্ কে সতুঁ
দামনে-দহ্র পে উস্ রংগ কী গ্লকারী হ্যয়
জিস্মেঁ সামিল হ্যয় তিরে ঔর মিরে অজদাদ কা খ্ঁ

... ...

মেরী মহব্ব ! উন্হে ভী তো মোহব্বত হোগী
জিনকী সন্নাঈ নে বখ্শী হ্যয় ইসে শক্লে-জমীল
উনকে প্যায়ারোঁ কে মকাবির রহে বেনামো-ন্ম্দ
আজ তক উন পে জলাঈ ন কিসী নে কিংদীল

... ...

ইয়ে চমনজার ইয়ে যমনা কা কিনারা, ইয়ে মহল
ইয়ে ম্নক্কশ দরো-দীবার, ইয়ে মহেরাব ইয়ে তাক্
ইক শহনশাহ্ নে দৌলত কা সহারা লেকর
হম গরীবোঁ কী মোহব্বত কা উরায়া হ্যয় মজাক্
মেরী মহব্ব ! কহীঁ ঔর মিলা কর ম্ঝসে।

–এই তাজ তোমার জন্য এক প্রণয়স্থল তো বটেই, এই অপ্র্ব রমণীয় প্রাসাদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা হয়তো ছিল, তব্ আমি আমার প্রিয়তমাকে বলব, এখানে নয়, এখানে নয় প্রিয়া আর কোথাও আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

... ...

তুমি কি দেখেছ প্রিয়া! শাহী বৈভবের দম্ভ এই সাহানা দরবারের প্রতিটি দরো-দিওয়ারে রয়েছে অঙ্কিত, এখানে তো রয়েছে শ্ধ্ কবরস্তানের নিস্তব্ধতা। এখানে প্রেমিকের সেই অন্রাগভরা হৃদয়ের আকুতি কোথায় ?

আমার মহবুব তুমি কি নজর করে দেখছ এই বিশাল হর্মের গহবরে প্রেমের কঙ্কাল ঐ মকবারাকে ? ঐ অন্ধকার রুদ্ধশ্বাস কারায় কোথাও কি প্রেম জাগরুক আছে ?

... ...

এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রেমিকরা প্রেম করেছে, কে বলবে তাদের প্রেম সত্য ছিল না ? অসংখ্য সাধারণ মানুষ যে প্রেম করেছে কিন্তু তার কোন সাক্ষী তো তারা রাখতে পারেনি, কেননা তারা আমাদের মতই গরিব ছিল।

... ...

এই বিশাল হর্ম, মস্ত ইমারত, এই দুর্গের ফসিল এই শাহেনশাহী শান, দুনিয়ার ছাতির ওপর দম্ভভরে দাড়ানো এই কঠিন পাথুরে স্তম্ভে প্রেমের বুনিয়াদ ! না না প্রিয়া না এখানে নয় এখানে নয়। এখানে তো তোমার আমার আরও অনেকের পূর্বপুরুষের হৃদয়ের রক্ত লেখার পরিচয় রয়েছে।

... ...

যারা এই অপূর্ব সুন্দর কারিগরি করেছিল তাদের হৃদয়েও তো প্রেম ছিল, তবেই না এই প্রাসাদকে এমন অপরূপ রূপ দিতে পেরেছিল। কিন্তু কোথাও কি তাদের নাম নিশা আছে ? আজ অবধি কি তাদের কবরখানায় একটি প্রদীপও কেউ জ্বালিয়েছে ?

... ...

এই বাগ এই বাগান এই বহতা যমুনার কিনারায় দাড়ানো এই বিশাল হর্ম, এক শাহেনশাহ তার ধনদৌলতের সাহারা নিয়ে আমাদের মত গরীবের প্রেমকে নস্যাৎ করতে চেয়েছে, না না প্রিয়া, না তুমি আর কোথাও আমার সঙ্গে দেখা কোরো, এখানে নয় !

২। চক্‌লে (বেশ্যালয়)

ইয়ে কূচে ইয়ে নীলামঘর দিলকশী কে,
ইয়ে লুট্‌তে হুয়ে কারওয়াঁ জিন্দগী কে,
কহাঁ হ্যয় ? কহাঁ হ্যয় মুহাফিজ খুদী কে,
সনা-খ্বানে-তক্‌দীসে-মশ্‌রিক কহাঁ হ্যয় ?

ইয়ে পুরপেচ গলিয়াঁ, ইয়ে বেখ্বাব্ বাজার,
ইয়ে গুমনাম রাহী, ইয়ে সিক্কোঁ কী ঝন্‌কার,
ইয়ে ইস্মত্ কে সোদে, ইয়ে সোদে পে তকরার,
সনা-খ্বানে-তকদীসে-মশ্রিক কহাঁ হ্যয় ?

ইয়ে সদীওসে বেখ্বাব্ সহমিসি গলিয়াঁ
ইয়ে মস্‌লি হুঈ অধখিলী জর্দ কলিয়াঁ
ইয়ে সুবক্‌তি হুঈ খোখলী রঙ্গ্-রলিয়া,
সনাখ্বানে-তকদীসে-মশরিক কহাঁ হ্যয় ?

উয়ো উজলে দরীচোঁ মেঁ পায়ল কী ছন্-ছন্,
তনফ্‌ফুস্ কী উল্‌ঝন পে তবলে কী ধম্-ধম্,
ইয়ে বেরূহ কমরোঁ মে খাঁসী কী ঢন্-ঢন্,
সনা-খ্বানে-তকদীসে-মশরিক কহাঁ হ্যয় ?

ইয়ে ফুলোঁ কী গজরে, ইয়ে পীকো কে ছীটে,
ইয়ে বেবাক নজরেঁ, ইয়ে গুস্তাখ্ ফিক্‌রে,
ইয়ে ঢলকে বদন ঔর ইয়ে মদকুক্ চেহ্‌রে,
সনা-খ্বানে-তকদীসে-মশারিক কহাঁ হ্যয় ?

যঁহা পীর ভী আ চুকে হ্যয় জওয়াঁ ভী
তনুমঁদ, বেটে ভী, অব্বা মিয়াঁ ভী
ইয়ে বীবী ভী হ্যয় ঔর বহন ভী হ্যয়, মা ভী,
সনা-খ্বানে-তকদীসে-মশরিক কহাঁ হ্যয় ?

মদদ্ চাহ্‌তী হ্যায় ইয়ে হুব্বা কী বেটী,
যশোদা কী হমজিন্সম্, রাধা কী বেটী,
পয়ম্বর কী উম্মত্ জুলেখা কী বেটী,
সনা-খ্বানে-তকদীসে-মশরিক কহাঁ হ্যায় ?

জরা মুল্ককে রহবরো কো বুলাযো
ইয়ে কুচে, ইয়ে গলিয়াঁ, ইয়ে মঞ্জর দিখায়ো,
সনা-খ্বানে-তকদীসে-মশরিক কো লায়ো।
সনা-খ্বানে-তকদীসে-মশরিক কহাঁ হ্যায় ?

–এই যে জীবনের নীলামঘরে কীভাবে যৌবন বিকোচ্ছে
তাকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না ?
কোথায় গেলে সব সমাজ সংস্কারক, সমাজপতি
আর পূব দেশের পবিত্রতা রক্ষকেরা ?
এই অন্ধ গলির গন্ধগীতে এই বেখাপ্পা বাজারে,
এই বেনামা সড়কে শুনতে পাচ্ছ না পয়সার ঝনৎকার ?
এই দেহের ব্যাপার, এই ব্যবসার মোলতোল তকরার
কোথায় গেলে সব পূব দেশের পরিত্রাতা আর সমাজপতিরা
এই দুর্গন্ধ গলি আর তার আড়ালে দোমরানো মোচরানো
ঐ কিশোরী শরীর
দেহের ব্যাপারে বিকিয়ে যাওয়া এক অসার যৌবন,
কোথায় গেলে সব সমাজপতিরা ?
শুনতে পাচ্ছ না বুকফাটা কান্না আর যক্ষার কাশীর ঢনঢন শব্দ
ঐ শির-ওঠা পায়ে পায়েলের ঝমঝম ?
ওহে সমাজপতিরা এসো পতিতোদ্ধার করো!
এই চতুর্দিকে পানের পিকের ছিটে

ঐ বিগত যৌবনকে ফুলের গজরা দিয়ে ঢাকার প্রয়াস,
তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না ?
এখানে পীর মুরসেদ, বেটা বাপ জওয়ান বুড়ো
সবাই একই সিঁড়ি ভেঙ্গে চলেছে ঐ সওদাগরীর ঘরে,
এখন তারা ভুলে গেছে যে এরা তাদেরই মা, বোন, বেটী
আর তাদেরই দয়ার প্রত্যাশি,
ক্ষয় রোগের আকর ঐ ঘুনধরা শরীরে আর ঐ নিরক্ত চোখে
একটু করুণার আশা

ওগো পরিত্রাতারা এসো, দেখ।
এরাই সেই হাব্বার বেটী, যশোদার বংশজ, রাধার কন্যা
আর জুলেখার বেটী, তাদেরই তো সমগোত্রিয় এরা—
তবে কেন এত হ্যানস্থা এদের ?
হে পয়গম্বরের পূজারী ধর্মের ধ্বজা, সমাজ সংস্কারকরা
কোথায় গেলে ?
এসো এসে দেখ তোমাদের এই অমানুশিক পাশবিকতার
প্রতিচ্ছবি, ঐ অন্ধ গলির অন্তরালে তোমাদেরই লালসার
শিকার এই বিবশ দেহের বেসাতি,
এসো তোমরা, পরিত্রাতার দল, পারতো এদের ত্রান কর।

৩। ঔরত নে জনম দিয়া মর্দো কো

ঔরত নে জনম দিয়া মর্দো কো, মর্দো নে উসে বাজার দিয়া,
জব জী চাহা মসলা-কুচলা, জব জী চাহা দুত্কার দিয়া,
তুলতী হ্যয় কহী দীনারোঁ মেঁ, বিকতী হ্যয় কহী বাজারোঁ মেঁ,

নঙ্গী নচ্‌ওয়াই জাতী হ্যয়, এয়াশোঁ কে দরবারোঁ মেঁ
ইয়ে উয়ো বেইজ্জত চীজ হ্যয় জো বঁট জাতী হ্যয় ইজ্জতদারোঁ মেঁ,
মর্দো কে লিয়ে হর জুলম্‌ রওয়া, ঔরত কে লিয়ে রোনা ভী খতা,
মর্দো কে লিয়ে লাখোঁ সেজেঁ, ঔরত কে লিয়ে বস্‌ এক চিতা,
মর্দো কে লিয়ে হর অয়েশ্‌ কা হক্‌, ঔরত কে লিয়ে জীনা ভী সজা।
জিন্‌ সীনোঁ নে ইনকো দুধ দিয়া
উন সীনোঁ কা ব্যাপার কিয়া,
জিস্‌ কোখ মেঁ ইনকা জিস্ম্‌ ঢলা
উস্‌ কোখ কা কারোবার কিয়া,
মর্দো নে বনাঈ জো রস্মে, উনকী হক কা ফর্মান কহা,
ঔরত্‌ কে জিন্দা জলনে কো কুর্বানী ঔর বলিদান কহা,
সংসার কী হর ইক বেশর্মী গুরবত্‌ কী গোদ মেঁ পলতী হ্যয়
চকলোঁ মেঁ আকর রুকতী হ্যয়, ফাকোঁ সে জো রাহ্‌ নিকলতী হ্যয়,
মর্দো কী হবস হ্যয় জো অকসর ঔরত কে পাপ মেঁ ঢলতী হ্যয়।

—নারী জন্ম দিল পুরুষকে, পুরুষ দিল তাকে বাজার
যখন ইচ্ছে তাকে ভোগ করল, যখন ইচ্ছে তকে বদনাম আর
ধিক্কার দিল,
কখনো তাকে টাকা নিয়ে বেচে দিল, উলঙ্গ করে নাচাল,
ইজ্জতদার পুরুষরা নারীর ইজ্জত নিয়ে খেলা করে,
পুরুষের জন্য কোন কিছুই পাপ নয়, মেয়েদের কান্নাও অন্যায়।
পুরুষ সারা জীবনে কত কিছু রোশন করে কিন্তু
নারীর জন্য রয়েছে শুধু চিতার আগুন!
পুরুষ সব রকম আনন্দ করবে কিন্তু নারী! তার বেঁচে
থাকাটাই লাঞ্ছনা!

যে বুকের দুধ খেয়েছে পুরুষ সেই বুকেই হানছে শেল,
যে গর্ভে জন্ম নিয়েছে সেই গর্ভের ব্যবসা খুলেছে।
পুরুষরা যে নিয়ম বানাল তাকেই তারা নিজেদের হক্‌দার বলল
নারী যখন জীবন্ত চিতায় পুড়ে মরল, তাকে তারা ত্যাগ আর
বলিদানের মহিমা দিল,
নিজেরা তাদের ইজ্জতের বদলে যে রুটি দিল তার নাম দিল দয়া।
এই নির্লজ্জ বেহায়া পুরুষ নারীর লজ্জা কিভাবে ঢাকবে!
বরং নিয়ে গিয়ে তাকে বেশ্যালয়ে পৌঁছে দেবে, মজা লুটবে এদের
নিয়ে। নারী যে এদের পন্য তাই তাকে নিয়ে করবে যথেচ্ছাচার,
সেটা পাপ নয়!

৪। ম্যঁয়নে চাঁদ ঔর সিতারোঁ কী তমন্না কী থী

ম্যঁয়নে চাঁদ ঔর সিতারোঁ কী তমন্না কী থী।
মুঝকো রাতোঁ কো সিয়াহী কে সিবা কুছ ন মিলা।
ম্যঁয় উয়ো নগমা হুঁ জিসে প্যার কী মহ্‌ফিল্‌ ন মিলী
উয়ো মুসাফির হুঁ জিসে কোঈ ভী মঞ্জিল ন মিলী
জখ্‌ম্‌ পায়ে হ্যয়, বহারোঁ কী তমন্না কী থী
ম্যঁয়নে চাঁদ ঔর সিতারোঁ কী তমন্না কী থী
কিসী গেসু, কিসী আঁচল কা সহারা ভী নহীঁ
রাস্তে মেঁ কোই ধুঁদলা-সা সিতারা ভী নহীঁ
মেরী নজরোঁ নে নজারোঁ কী তমন্না কী থী
ম্যঁয়নে চাঁদ ঔর সিতারোঁ কী তমন্না কী থী

প্যার মাঙ্গা তো সিসক্তে হুয়ে অর্মান মিলে
চৈন্ চাহা তো উমড়্তে হুয়ে তুফান মিলে
ডুবতে দিল নে কিনারোঁ কী তমন্না কী থী
মঁয়নে চাঁদ ঔর সিতারোঁ কী তমন্না কী থী।

—আমি চাঁদ আর তারার আলোর দীপ্তি চেয়েছিলাম
কিন্তু রাতের কালো অন্ধকার ছাড়া জীবনে কিছুই জুটল না।
আমি এমনই এক জহরত যে কেউ তার দাম দিল না।
এমনি এক ভবঘুরে যে কোথাও ঘর খুঁজে পেলাম না,
সুখের আশা করতে গিয়ে দুঃখে হাবুডুবু খেয়েছি।
চাঁদ আর তারার আলো কামনা করেছি,
কেউ তার আঁচলে আমায় আশ্রয় দেয় নি।
কোন নিস্প্রভ তারা আমায় তার ম্লান আলোটুকুও দেয়নি।
আমার নজর কারুর শুভদৃষ্টির অভিনন্দন চেয়েছিল,
আমি চাঁদ আর তারার আলোর কামনা করেছি।
ভালবাসা চাইতে গিয়ে প্রানটা হাহাকারে ভরে গেছে,
একটু শান্তি চেয়েছি তো দুঃখ আর অশান্তির ঝড় বয়ে গেছে,
নিরাশ হৃদয়ে একটু আশার আলো চেয়েছি,
তাই চাঁদ আর তারার আলোর কামনা করেছি।

৫। মতা-এ-গৈর (অন্যের আমানত)

মেরে খোয়াবোঁ কে ঝরোকোঁ কো সজানে ওয়ালী।
তেরে খোয়াবোঁ মেঁ কহীঁ মেরা গুজর হায় কি নহীঁ ?

পুছকর অপনী নিগাহোঁ সে বতা দে মুঝকো।
মেরী রাতোঁ কে মুকদ্দর মেঁ সহর হ্যয় কি নহীঁ ?
চার দিন কী ইয়ে রফাকত্ জো রফাকত্ ভী নহীঁ।
উম্র ভর কে লিয়ে আজার হুঈ জাতী হ্যয় ॥
জিন্দগী ইউঁ তো হামেশা সে পরীশান-সী থী।
অব তো হর সাঁস গিরা-বাঁর হুঈ জাতী হ্যয় ॥
মেরা উজড়ী হুঈ নীদোঁ কে শাবিস্তানোঁ মেঁ।
তু কিসী খোয়াব কে পৈকর কী তরহ আঈ হ্যয় ॥
কভী অপনী-সী, কভী গৈর নজর আতী হ্যয়।
কভী ইখলাস্ কী মুরত্, কভী হরজাঈ হ্যয় ॥
প্যার পর বস্ তো নহীঁ হ্যয় মিরা, লেকিন ফির ভী।
তু বতা দে কি তুঝে প্যার করূঁ ইয়া ন করূঁ ॥
তুনে খুদ অপনে তবস্সুম সে জগায়া হ্যয় জিন্হেঁ।
উন তমন্নায়োঁ কা ইজহার করূঁ ইয়া ন করূঁ ?
তু কিসী ঔর কে দামন কী কলী হ্যয়, লেকিন।
মেরী রাতেঁ তেরী খুসবু সে বসী রহতী হ্যয় ॥
তু কহীঁ ভী হো তিরে ফুলসে আরিজ কী কসম্।
তেরী পলকেঁ মেরী আখোঁ পে ঝুকা রহতী হ্যয় ॥
তেরে হাথোঁ কী হরারত, তেরে সাঁসো কী মহক্।
তৈর্তী রহ্তী হ্যয় এহ্সাস্ কী পহ্নাঈ মেঁ ॥
ঢুঁড়তী রহতী হ্যয় তখঈল কী বাহেঁ তুঝকো।
সর্দ রাতো কী সুলগতী হুঁঈ তনহাঈ মেঁ ॥
তেরা অল্তাফো-করম এক হকীকত্ হ্যয়, মগর।
ইয়ে হকীকত্ ভী হকীকত্ মেঁ ফসানা হী ন হো ॥
তেরী মানুস নিগাহো কা ইয়ে মোহ্তাত্ পয়াম।

দিল কে খুন করনে কা ইক ঔর বহানা হী ন হো ।।
কৌন জানে মেরে ইমরোজ কা ফর্দা কেয়া হ্যায় ।
কুরবতে বড়কে পশেমান ভী হো জাতী হ্যায় ।।
দিল কে দামন সে লিপটতী হুঈ রংগী নজরে ।
দেখতে দেখতে অনজান ভী হো জাতী হ্যায় ।।
মেরী দরমাঁদা জওয়ানী কী তমন্নায়োঁ কে ।
মুজমহিল খোয়াব কী তাবীর বতা দে মুঝকো ।।
তেরে দামন মেঁ গুলিস্তাঁ ভী হ্যায় বীরানে ভী ।
মেরা হাসিল মিরী তকদীর বতা দে মুঝকো ।।

—ওগো আমার স্বপ্ন সুন্দরী, আমার কল্পনার কায়া, তোমার স্বপ্নেও কি আমার উপস্থিতি আছে ?
তুমি তোমার ঐ ব্রীড়াবনত চক্ষের মুখর ভাষায় বল, বল না গো, আমার রাতের ভাগ্যে কখনো কি সকাল আসবে ?
মাত্র ক'দিনের এই পরিচয় তাই তো যেন সারা জীবনের ভীত নাড়িয়ে দিয়েছে ।
এখন তো আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসই দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু আমার এই জাগৃতির অস্থিরতার বিছানার গরমে তোমাকে যে আমি একান্ত করে কাছে পাই। কখনো মনে হয় তুমি আমার বড় আপন আবার কখনো সচেতন হয়ে উঠে ভাবি, না না তুমি তো অন্যের আমানত, কিন্তু তোমাকে যে আমি একান্ত করে ভালবেসেছি ! আর ভালবাসার ওপর জোর খাটে? বল না, তুমিই বল, তোমাকে ভালবাসাব কি বাসব না ? তুনি নিজেই তোমার নম্র হাসির প্রশ্রয়ে যাকে জাগিয়েছ, তোমার সেই অব্যক্ত ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করব কি না ? তুমি আর কারুর বাগানের কলি কিন্তু

তবু আমার রাতগুলি তোমারই সুগন্ধে মোহিত হয়ে থাকে।
তুমি যেখানেই থাক তবু তোমার ঐ ফুলের মত কোমল কপোলের কুসুম, তোমার চোখের ঐ ঘন পল্লব ঘেরা আঁখি আমার চোখে ছায়া ফেলে, তোমার নরম গরম হাতের ছোঁয়া, তোমার মিষ্টি গন্ধ-ভরা নিঃশ্বাস, তোমার দেহের উষ্ণতা দারুণ এই শীতের রাতেও আমার সমস্ত স্নায়ুতে আগুন ছড়ায়, আমি আশ্লেষে তোমায় আলিঙ্গন করি। মনে হয় যেন সত্যি সত্যিই তুমি আমার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছ। আমার নিঃসঙ্গতা কেটে যায়, অপার এক আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকি। তোমার কৃপায় বাস্তবে যা আমি পাই তা সত্যিই কি অবাস্তব? কিন্তু তুমি যদি আমার এই বাস্তবকে অস্বীকার কর, তোমার ঐ পরিচিত প্রশ্রয় ভরা কটাক্ষ কি মিথ্যে? আমার হৃদয়টা রক্তাক্ত করার জন্যই কি তোমার এক মিথ্যে প্রয়াস? কে জানে আমার এই হৃদয় ভরা প্রেম কখনো তোমার কাছে ব্যক্ত করতে পারব কি না! নাকি অপারগতার বেদনায় আমার মধ্যেই তা অব্যক্ত থেকে যাবে! আমার মনের মধ্যেকার আজকের এই গভীর আর্তি, এই পাগল করা দৃষ্টির বিনিময়, দেখতে দেখতে এও হয়তো একদিন আমার মধ্যেই বিলিন হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানের এই বিবস শিথিল যৌবনের আকাঙ্খার স্বপ্ন-ফল আমায় তুমি বলে দাও। তোমার আঁচলে প্রস্ফুটিত ফুলও আছে, নিঃসঙ্গতার বেদনাও আছে। কিন্তু আমার ভাগ্যে কি জুটবে তা তুমি আমায় বলে দাও সুন্দরী।

গীত (ভোজপুরী)

আজ সজন মোহে অঙ্গ লগা লো, জনম সফল হো জায়
হৃদয় কী পীড়া, দেহ কী অগ্নী, সব শীতল হো জায়
কিয়ে লাখ জতন
মেরে মন কী তপন, মোরে তন্ কী জলন নহী জায়
কৈসী লাগী ইয়ে লগন
কৈসী জাগী ইয়ে অগন, জিয়া ধীর ধরন নহী পায়
প্রেম সুধা ইতনী বরসা দো, জগ জল থল হো জায়
আজ সজন মোহে অঙ্গ লগা লো জনম সফল হো জায়
মোহে অপনা বনা লো, মোরী বাঁহ পকড়
ম্যয় হুঁ জনম্ জনম্ কী দাসী
মোরী ইয়াস্ বুঝা দো, মনহর, গিরধর
ম্যয় হুঁ অন্তরঘট তক্ পিয়াসী
প্রেম সুধা ইত্নী বরসা দো, জগ জল-থল হো জায়
আজ সজন মোহে অঙ্গ লগা লো জনম সফল হো জায়।

—প্রিয় আমার আজি এসো আসঙ্গে, আমায় বুকে ধরো, আমার জনম সফল হয়ে যাক। হৃদয়ের পীড়া, দেহের অগ্নি সব শীতল হয়ে যাক। লাখো যতন করলাম তবু আমার দেহ মনের জ্বালা জুড়োতে পারলাম না। কোন লগনে যে মিলন হল!

আমি যে কিছুতেই আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। আজ প্রেম সুধা এতই বর্ষাও যে সারা জগত প্লাবিত হয়ে যাক, সব একাকার হয়ে যাক। আজ প্রিয় আমার অঙ্গে এসো, জনম সফল হয়ে যাক।

আমার হাত ধরে সখা তুমি আমায় আপন করে নাও। হে গিরিধারী আমিই যে তোমার জন্ম-জন্মান্তরের দাসী। তুমি আমার এই অনন্ত পিপাসা মিটিয়ে দাও প্রভু, আমি যে আকণ্ঠ পিপাসিত। প্রেম সুধা এতই বরসাও যে সমস্ত জগত প্লাবিত হয়ে যাক।

আজ প্রভু আমায় অঙ্গে ধরো, জনম সফল হয়ে যাক।

বিঃ দ্রঃ সাহির লুধিয়ানবীর এই গীতটি যেন সেই চণ্ডীদাসের পদাবলী, তিনিও গেয়েছিলেন—

লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল ...।